সবার আগে বাংলাদেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ইশতেহার
২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

করবো কাজ, গড়বো দেশ

"১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে জনগণের দিন, ইনশাআল্লাহ"

— তারেক রহমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

সূচি

প্রথম অধ্যায়: রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার **৬-১১**

- গণতন্ত্র ৬
- মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ৬
- সাংবিধানিক সংস্কার ৭
- জাতিগঠন ৮
- সুশাসন (দুর্নীতি দমন, আইনের শাসন, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ) ৯
- স্থানীয় সরকার ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়: বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন **১২-২৭**

- দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক সুরক্ষা ১২
- নারীর ক্ষমতায়ন ১২
- কৃষক, কৃষি উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য ১৩
- দেশব্যাপী কর্মসংস্থান ১৫
- যুব উন্নয়ন ১৬
- শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ১৭
- স্বাস্থ্যসেবা ১৯
- শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণ ২১
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ ২২
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী ২২
- সামাজিক ব্যাধির সমস্যা ২৪
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন ২৫
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ২৬
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ২৬
- পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২৬
- প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ২৬
- পররাষ্ট্রনীতি ২৭

তৃতীয় অধ্যায়: ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার **২৮-৩৮**

- অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ণ – ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি ২৮
- বিনিয়োগ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ২৮
- বেসরকারি খাত উন্নয়ন ২৯
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানখাত সংস্কার ২৯
- পুঁজিবাজার সংস্কার ও উন্নয়ন ৩০
- বাণিজ্য সহজীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ ৩০
- শিল্পখাত ৩১
- কারু ও হস্তশিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ৩১
- সেবাখাত ৩১
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন ৩২
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৩৩
- যোগাযোগ ও পরিবহন খাত ৩৪
- সুনীল অর্থনীতি ৩৫
- সৃজনশীল অর্থনীতির উন্নয়ন ৩৬
- রাজস্ব আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা ৩৭

চতুর্থ অধ্যায়: অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন **৩৯-৪১**

- চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা ৩৯
- উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন ৩৯
- হাওড়-বাওড় অঞ্চলের উন্নয়ন ৩৯
- উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন ৩৯
- নগরায়ণ ও আবাসন ৩৯
- নিরাপদ ও টেকসই ঢাকা বিনির্মাণ ৪০
- পর্যটন খাত ৪০

পঞ্চম অধ্যায়: ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতি **৪২-৪৪**

- ধর্মীয় সম্প্রীতি ৪২
- পাহাড় ও সমতলের নৃগোষ্ঠী ৪২
- ক্রীড়া ৪৩
- গণমাধ্যম ৪৩
- শিল্প ও সংস্কৃতি ৪৪
- নৈতিকতার শক্তি পুনরুদ্ধার ৪৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুখবন্ধ

দীর্ঘ ১৮ বছরের ভোটাধিকারহীনতা, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, বিচারহীনতা ও ভয়ভীতির রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে ছাত্র–জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান আবারও প্রমাণ করেছে— বাংলাদেশের আপামর জনতা গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে আপসহীন। সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে হাজারো শহীদের রক্ত, জুলাই যোদ্ধাদের অসীম আত্মত্যাগ এবং শহীদ মায়েদের প্রত্যাশা আমাদের সামনে একটি অনিবার্য দায়িত্ব তুলে দিয়েছে – একটি বৈষম্যহীন, মেধাভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলা, যার লক্ষ্য মানবিক, জনগণকেন্দ্রিক ও ইনসাফ-ভিত্তিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে—রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়। বরং জনগণই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। কিন্তু গত দেড় দশকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুপস্থিতি, গুম–খুন–নির্যাতন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, বিচারব্যবস্থার দলীয়করণ ও সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রের মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান। কেবল সরকার পরিবর্তন নয়; বরং ভয়, নিপীড়ন, বৈষম্য ও ভোটহীনতার বিরুদ্ধে জনগণের চূড়ান্ত রায়।

বাংলাদেশ এবং বিএনপি অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি অধ্যায়ে বিএনপির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ইতিহাসে প্রমাণিত। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে রণাঙ্গনে নেতৃত্ব, ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বাকশালের বদলে বহুদলীয় গণতন্ত্র, বিচার বিভাগ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আপোষহীন আন্দোলনে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি থেকে বেরিয়ে এসে সারাবিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পৃক্ততা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান – প্রতিটি অধ্যায়ে বিএনপি জনগণের শক্তিতে ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী সব সংস্কার এসেছে বিএনপি'র হাত ধরে।

বিএনপি প্রতিবারই ধ্বংসের মুখ থেকে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করেছে। দুর্ভিক্ষ ও বাকশাল পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কৃষিতে সবুজ বিপ্লব, জনশক্তি রপ্তানি এবং শিল্প উৎপাদনের বিস্তার করে অর্থনীতিতে পুনর্জীবন দান করেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কৃষি উন্নয়ন, গার্মেন্টস ও রেমিট্যান্স জিয়াউর রহমানেরই অবদান। তিনিই প্রথম একটি বিশেষ ব্লকবদ্ধ অর্থনীতিকে প্রাথমিকভাবে মিশ্র ও পরবর্তীতে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে রূপান্তর করেন। সার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক কূটনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণতকরণ, ওআইসি তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তি রচনা করেন, যার ফলে বাংলাদেশ প্রথম স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দর্শন প্রবর্তন, গণমাধ্যমকে মুক্ত করে স্বাধীন গণমাধ্যম ও বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তিনি ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন ও দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন।

বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচারের রেখে যাওয়া ভাঙ্গা অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ, বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের বিস্তৃতি, মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির পথপরিক্রমা সূচনা করেন। তিনি ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন, শুল্ক ও আমদানি কাঠামোর আধুনিকায়ন এবং বেসরকারি বিনিয়োগবান্ধব নীতির মাধ্যমে অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। নারীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, নারীর আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ, শিশু ও মাতৃসেবার উন্নয়ন, প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীতে নারীদের সমান অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রদূতে পরিণত হন। বিএনপি'র শাসনামলেই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত করা হয়। তাঁর সময়ে বিশ্বে বাংলাদেশ ইমার্জিং টাইগার হিসেবে খ্যাত হয়।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা রাষ্ট্রদর্শন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভিশন-২০৩০ এবং চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা – এই ধারাবাহিকতাই বিএনপির রাজনীতির মৌলিক ভিত্তি। বিএনপি'র রাজনীতি

স্লোগান নির্ভর নয়, বরং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ভিত্তিক। 'সবার আগে বাংলাদেশ' দর্শনের ভিত্তিতে এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাপক সামাজিক পরিকল্পনা মানুষের কর্মসংস্থান, সুশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সুষম উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, আইনের শাসন এবং সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশকে বাস্তব উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। এই প্রেক্ষাপটে, চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত **"We have a plan"** এর আলোকে বিএনপি একটি মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণে জনগণের সামনে নিম্নোক্ত নির্বাচনি অঙ্গীকারসমূহ উপস্থাপন করছে:

নির্বাচনী অঙ্গীকার: প্রধান প্রতিশ্রুতি

● প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা অথবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। অর্থ সেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে।

● কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে 'কৃষক কার্ড'-এর মাধ্যমে ভর্তুকি, সহজ ঋণ, কৃষি বীমা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাজারজাতকরণ জোরদার করা হবে। মৎস্যচাষি, পশুপালনকারী খামারি ও কৃষি খাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এই সুবিধা পাবেন।

● দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশব্যাপী এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, জেলা ও মহানগর পর্যায়ে মানসম্মত চিকিৎসা, মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

● আনন্দময় ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তব দক্ষতা ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব, শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি সহায়তা এবং 'মিড-ডে মিল' চালু করা হবে।

● তরুণদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কারিগরি ও ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন, স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা সহায়তা, বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে যুক্তকরণ এবং মেধাভিত্তিক সরকারি নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

● ক্রীড়াকে পেশা ও জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে।

● পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারে দেশপ্রেমী জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী, খাল খনন ও পুনঃখনন, পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ এবং আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে।

● ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে সব ধর্মের উপাসনালয়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য সম্মানী ও প্রশিক্ষণভিত্তিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

● ডিজিটাল অর্থনীতি ও বৈশ্বিক সংযোগ বাড়াতে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম (পেপাল) চালু, ই-কমার্সের আঞ্চলিক হাব স্থাপন এবং 'মেড ইন বাংলাদেশ' পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণ করা হবে।

এই ইশতেহার কেবল নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয়; এটি একটি নতুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চুক্তির ঘোষণা। বিএনপি প্রতিশোধ নয়, ন্যায় ও মানবিকতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। ক্ষমতা নয়, জনগণের অধিকারই আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। লুটপাট নয়, উৎপাদন; ভয় নয়, অধিকার; বৈষম্য নয়, ন্যায্যতা—এই নীতিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

জনগণের রায়ে দায়িত্ব পেলে বিএনপি এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, যেখানে ভোটের মর্যাদা থাকবে, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বৈষম্যের অবসান হবে, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ থাকবে না এবং প্রতিটি নাগরিক গর্ব করে বলতে পারবে—**সবার আগে বাংলাদেশ**।

সবার আগে বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার

গণতন্ত্র

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিএনপি জবাবদিহিমূলক, দায়বদ্ধ ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে একটি টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দর্শন হবে 'সবার আগে বাংলাদেশ'।

৩১ দফা ও জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন: মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা, 'গণতন্ত্রের মাতা' দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভিশন-২০৩০, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা এবং 'জুলাই জাতীয় সনদে' যে সকল বিষয়ে যে আঙ্গিকে ঐকমত্য ও স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলো সেভাবে বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

ফ্যাসিবাদ ও তাঁবেদারিত্বের পুনরাবৃত্তি দমন: ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে আর কখনোই ফ্যাসিবাদ কায়েম ও গণতন্ত্র হত্যা করতে দেওয়া হবে না। বাংলাদেশকে কারোরই তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে দেওয়া হবে না।

বৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: সুনীতি, সুশাসন ও সু-সরকার–এর সমন্বয়ের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ভোটকে রাষ্ট্রক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা: বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে ভোটবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল। বিএনপি জাতীয় ও স্থানীয়—সব ধরনের নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ভোটের ভিত্তিতে আয়োজন নিশ্চিত করতে চায়। জনগণের ভোটকে রাষ্ট্রক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে। জনগণের সরাসরি ভোটে দায়বদ্ধ একটি রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠাই বিএনপির লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত জনগণ, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। শুধু নির্বাচনের দিনে সীমাবদ্ধ না রেখে, গণতন্ত্রকে নিত্য দিনের অনুশীলনে রূপান্তর করে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং ন্যায়পরায়ণ বাংলাদেশ গঠন: মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শকে সমুন্নত রেখে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় বিএনপি'র মূলমন্ত্র হবে 'ন্যায়পরায়ণতা'। মহানবীর ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে উজ্জীবিত ইনসাফ-ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

রাষ্ট্রের প্রত্যেক স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা: গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে জবাবদিহিতাকে অবিচ্ছেদ্য করে তুলে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে। সরকার, বিরোধী দল, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক কর্মী, মেয়র, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, মেম্বার, যেই হোক না কেন প্রত্যেকের জবাবদিহিতা থাকতে হবে জনগণের কাছে।

'জনকল্যাণমূলক সরকার' গঠন: গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহকে সঙ্গে নিয়ে জনকল্যাণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন করা হবে।

গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা: এমন একটি উদার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ করা হবে, যেখানে কোনো মত, বিশ্বাস বা পরিচয় অবমূল্যায়িত হবে না। মুক্ত ও নিরাপদ মতপ্রকাশ, স্বাধীন গণমাধ্যম এবং বাধাহীন চিন্তার পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে। ১৯৭৫ সালে সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও ১৯৯০ সালে ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। রক্তার্জিত সেই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং বিপ্লব ও অভ্যুত্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সেই গণতন্ত্র আবার রক্ষা ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ: রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিবিড় জরিপের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং তাঁদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান নিশ্চিত করা হবে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণার্থে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধি এবং এই ভাতা ব্যবস্থাপনাকে দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা: বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিকৃত করেছিল। শিক্ষা কারিকুলামে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুক্তিযোদ্ধা উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ: আগ্রহী প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় যোগ্য ও দক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ: দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বধ্যভূমি ও গণকবর চিহ্নিত করে সেসব স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা হবে।

গণঅভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদদের নামে সরকারি স্থাপনার নামকরণ: জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এবং ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সকল শহীদের তালিকা প্রস্তুত করে নিজ-নিজ এলাকায় তাদের নামে সরকারি স্থাপনার নামকরণ করা হবে। শহীদ পরিবারগুলোকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

গণঅভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদদের সার্বিক সহায়তা প্রদান: গণঅভ্যুত্থানে ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যেসব গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি পঙ্গু হয়েছেন, চোখ হারিয়েছেন তাদেরকেও স্বীকৃতি, সুচিকিৎসা ও কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা হবে।

গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের কল্যাণার্থে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা: জনগণের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের দেখভালের জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই বিভাগ শহীদ ও আহতদের দায়েরকৃত মামলার বিচার দ্রুততর করা, সম্মানজনক জীবিকা এবং তাদের অসহায় সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবে। এই বিভাগে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের মধ্য থেকে যোগ্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

সাংবিধানিক সংস্কার

১. সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে বিগত ১৭ অক্টোবর ২০২৫ইং তারিখে জুলাই জাতীয় সনদ যে আঙ্গিকে ঐকমত্য ও স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলো সে মতে বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২. 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে পুনঃস্থাপন করা হবে। বিএনপি সকল বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সংশোধনী ও বিধানাবলী পর্যালোচনা ও পুনঃপরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কার করবে। রাষ্ট্র কাঠামোর গণতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে ৩১ দফার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কার সাধন করা হবে।

৩. বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি 'নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা কেমন হবে তা পরবর্তী সংসদে আলোচনা এবং স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। তবে বিচার বিভাগ ও রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বাইরে রাখতে চায় বিএনপি। উল্লেখ্য, বিএনপি সরকারের সময়ই এদেশে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল যা ফ্যাসিস্ট হাসিনা আমলে বাতিল করা হয়।

৪. একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃজন করা হবে এবং তিনি রাষ্ট্রপতির মতই নির্বাচিত হবেন।

৫. একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক, তিনি সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ব্যক্তি একই সঙ্গে দলীয় প্রধানের পদেও অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন।

৬. রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা হবে।

৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৮. সংবিধানের এককেন্দ্রিক চরিত্র অক্ষুন্ন রেখে বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতার লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও অন্যান্য পেশাজীবীদের সমন্বয়ে সংসদে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষ প্রবর্তন করা হবে। রাজনৈতিক দলসমূহ নিম্নকক্ষের অর্জিত আসন সংখ্যার আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে।

৯. আইনসভার উভয়কক্ষে দুইজন ডেপুটি স্পীকারের মধ্য থেকে একজন ডেপুটি স্পীকার সরকার দলীয় ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করা হবে।

১০. নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের প্রয়োজন হবে না। উচ্চকক্ষে কমপক্ষে ১০% নারী সদস্য থাকবেন।

১১. আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত (যেমন: যুদ্ধ পরিস্থিতি) এমন সব বিষয় ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে।

১২. সংবিধান সংশোধনী, অর্থবিল, আস্থাভোট এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি) ইত্যাদি ছাড়া অন্যসব বিল উচ্চকক্ষে প্রেরণ করা হবে। উচ্চকক্ষ কোন বিল সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের বেশি আটকে রাখলে তা উচ্চকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

১৩. আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনকালে জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত রাখা হবে।

১৪. দক্ষ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করার লক্ষ্যে জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হবে।

১৫. সরকারি কর্মকমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের জন্য এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাধারণ (অন্য সকল সেক্টরে) নিয়োগের জন্য যথোপযুক্ত শক্তিশালী কাঠামোতে রূপান্তর করা হবে।

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আইনানুসারে সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

১৭. সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুই জন বিচারপতির মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হবে।

১৮. রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে, প্রধান বিচারপতি প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

১৯. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে অধিকতর শক্তিশালী ও এর এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হবে।

২০. অধ:স্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।

২১. আইনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে স্থায়ী প্রসিকিউশন/এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২২. জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এসব কমিটিসহ জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ সংসদে প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

২৩. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সংবিধানে এরূপ বিধান যুক্ত করা হবে যে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে তিনি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

২৪. নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

২৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হবে।

২৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক যথাযথ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

২৭. পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করা হবে। এতদসংক্রান্ত অধ্যাদেশটি প্রয়োজনীয় সংস্কার/পর্যালোচনার মাধ্যমে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হবে।

২৮. একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন করার বিষয়টি সংসদে পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

২৯. জুলাই অভ্যুত্থানকালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে।

৩০. ঐতিহাসিক জুলাই ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের কারণে গণঅভ্যুত্থানকারীদের আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

৩১. 'ন্যায়পাল' নিয়োগ করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিএনপি আমলে সৃষ্ট 'কর ন্যায়পাল' পদটি বেশ কার্যকর বলে বিবেচিত হয়েছিল।

৩২. বেসরকারি খাতের দুর্নীতির তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৩৩. জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন গভরমেন্ট পার্টনারশিপ'- এর পক্ষভুক্ত করা হবে।

৩৪. আয়কর রিটার্ন প্রাইভেট ডকুমেন্ট হলেও দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যেন আদালতের মাধ্যমে তা তলব করতে পারবে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

৩৫. রাজনৈতিক দলের সাথে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা তাদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার – এ নীতিকে সমুন্নত রাখা হবে।

জাতি গঠন

বিএনপি বিশ্বাস করে—জাতি গঠন মানে কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা নয়, বরং বিভাজন অতিক্রম করে একটি অভিন্ন জাতীয় সত্তা নির্মাণ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্ম, অঞ্চল, নৃ-গোষ্ঠী, শ্রেণি ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে এক সূত্রে গেঁথে একটি ঐক্যবদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্প্রীতিমূলক জাতি গড়ে তোলা হবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে অগ্রসর হবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের অবসান ঘটানো: আমরা পাহাড়ে সমতলে যারাই আছি, আমাদের একটাই পরিচয়– আমরা সবাই বাংলাদেশী। জাতির সকল অংশ তথা ধর্মীয়, আঞ্চলিক ও নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে একটি সুসংহত জাতি গঠন করাই বিএনপি'র লক্ষ্য। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের অবসান ঘটানো হবে।

ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন: বিএনপি চায় বিভক্ত হয়ে পড়া এ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। বাংলাদেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পাহাড়ের মানুষ, সমতলের মানুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে মিলে আমরা গড়ে তুলব জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ড জাতীয় সত্তা। তাই সকল মতাদর্শের ঐকতান রচনার জন্য অব্যাহত আলোচনা, মতবিনিময় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার সেতুবন্ধ রচনাই হবে বিএনপি'র প্রয়াস।

'ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন' গঠন: আমাদের ৩১ দফা ঘোষিত 'ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কমিশন' এর আলোকে ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ও পুনর্বাসনমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় একটি 'ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী সময়ে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলোর সত্য উদ্ঘাটন করা হবে, যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের অর্থবহ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হবে, এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধীদের জবাবদিহি ও শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে।

সুশাসন

(দুর্নীতি, আইনের শাসন, জনপ্রাশাসন, বিচার বিভাগ ও পুলিশ)

বিএনপি মনে করে, সুশাসন হলো গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

শাসন ও বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইনসাফ। সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে মেধাভিত্তিক, স্বচ্ছ, দক্ষ ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তোলা হবে। দুর্নীতি ও অর্থপাচার দমন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা বিএনপির সুশাসন দর্শনের মূল।

ক. দুর্নীতি দমন

২০০১ সালে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়ে দুর্নীতি দমনে বিএনপি সরকারের কঠোর পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কলঙ্ক থেকে মুক্তি পায়। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে বিএনপি যখন রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নেয় তার অনেক আগেই বিশ্বে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়নের অপবাদ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং টাইগার হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উল্লেখ্য যে, কেবল ২০০১ সনেই নয়, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশও তৎকালীন আওয়ামীলীগের দুর্নীতি এবং লুটপাটের কারণে সারাবিশ্বে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। পরবর্তীতে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারই 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে আওয়ামী লীগের রেখে যাওয়া দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই বিএনপি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কঠোরভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বেগম খালেদা জিয়া'র সরকার তৎকালীন 'দুর্নীতি দমন ব্যুরো'কে সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে 'দুর্নীতি দমন কমিশন' গঠন করে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বিএনপি সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে প্রথম বছর থেকেই দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশ অগ্রগতি লাভ করতে শুরু করে। ফলে ২০০২ সালে প্রকাশিত টিআইবি রিপোর্টে বাংলাদেশের স্কোর ০.৪ থেকে উন্নীত হয়ে ১.২ হয়। ২০০৩ সালে ১.৩, ২০০৪ সালে ১.৪, ২০০৫ সালে ১.৫ এবং ২০০৬ সালে ২.০। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে দুর্নীতি কমতে থাকে। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের লাগামহীন দুর্নীতির ফলে ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের স্কোর আবারও কমতে থাকে।

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জনগণের রায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে দুর্নীতি দমন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণই হবে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার।

দুর্নীতি দমনে পদ্ধতিগত ও আইনি সংস্কার: বিএনপি দুর্নীতির সাথে কোন আপস করবে না। সমাজের সর্বস্তরে দুষ্টক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরার জন্য পদ্ধতিগত ও আইনের সংস্কারের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুদকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। দুদক সংস্কার সংক্রান্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত সংস্কারগুলো যথেষ্ঠ নয় বলে বিএনপি মনে করে।

উন্মুক্ত দরপত্র ও রিয়েল-টাইম অডিট নিশ্চিত করা: দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সর্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা, উন্মুক্ত দরপত্র, সম্পদ বিবরণী, রিয়েল-টাইম অডিট এবং শক্তিশালী তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করা হবে।

'সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স' প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন: ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়রানি ও জটিলতা নিরসনকল্পে সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স, ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল কর্মপ্রবাহ তৈরি করা হবে। একই সাথে, ঘুষ কিংবা অবৈধ লেনদেন নিরসনকল্পে সরাসরি শারীরিক যোগাযোগের পরিমাণ হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ন্যায়পাল নিয়োগ: সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একজন 'ন্যায়পাল' নিয়োগ করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিএনপি আমলে সৃষ্ট 'কর ন্যায়পাল' পদটি বেশ কার্যকর বলে বিবেচিত হয়েছিল বিধায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

সরকারি ব্যয় ও প্রকল্পের 'পারফরম্যান্স অডিট' বাস্তবায়ন: সরকারি ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের কেবল আর্থিক অডিটই নয়, 'পারফরম্যান্স অডিট' বাস্তবায়ন করা হবে। এতে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বাড়বে এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

অর্থপাচার রোধ ও ফ্যাসিস্ট আমলের পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনা: বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী আমলে সংঘটিত অর্থপাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং এতে চিহ্নিত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রটি অসম্পূর্ণ বিধায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ জরুরী ।

অন্যায়কারীর পরিচয় শুধুই অন্যায়কারী: অন্যায় যে করে সে কোনো দলের হতে পারে না। অন্যায় যে করে সে শুধুই অন্যায়কারী। আমাদের সকলকে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে অন্যায়কারীদের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, অন্যায়কে সহযোগীতাকারীও অন্যায়কারী।

খ. আইনের শাসন

সর্বস্তরে আইনের শাসন বাস্তবায়ন: বিএনপি আইনের শাসন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একই সাথে বিএনপি মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী। অবশ্যই আইনের শাসনের নামে কোনো প্রকার কালা-কানুনের শাসন কিংবা বেআইনি নিপীড়ন গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা হবে।

জুলাই-আগস্ট-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানসহ ফ্যাসিস্ট আমলের মানবতাবিরোধী অপরাধের সুবিচার নিশ্চিতকরণ: বিগত জুলাই-আগস্ট-২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানে এবং ফ্যাসিস্ট সরকার কর্তৃক গত দেড় দশক যাবত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় সংঘটিত গুম, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা, নির্মম শারীরিক নির্যাতন, ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত নির্মম হত্যাকাণ্ডসমূহের চলমান বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। যে সকল হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান শুরু হয়নি, সে সকল হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান শুরু করে দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করা হবে। ব্যক্তি হোক, সংগঠন হোক কিংবা দল হোক – সকল অন্যায়কারীর বা জুলুমকারীর বিচার নিশ্চিত করা হবে।

গুম প্রতিরোধ ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ: গুম মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আজ পর্যন্ত একটি গুমের ঘটনারও ন্যায়বিচার হয়নি। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কোনো ব্যক্তি যেন গুম না হয়, সেটি নিশ্চিত করার জন্য বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেশন (আইসিপিপিইডি) অনুসারে দ্রুত যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খুন-গুমের স্বীকার শহীদদের নামে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও প্রতিষ্ঠান নামকরণ: ফ্যাসিস্ট আমলে গুম-খুনের শিকার হয়ে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের নামে গুরুত্বপূর্ণ সড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি স্থাপনার নামকরণ করা হবে, যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই শহীদদেরকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করতে পারে।

গুম বিষয়ক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ: গত ফ্যাসিস্ট শাসনামলে গুম হওয়া মানুষদের তালিকা সম্বলিত একটি কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।

জুলাই স্মৃতিসৌধ: জুলাই স্মৃতিসৌধকে 'কেন্দ্রীয় জুলাই স্মৃতি সৌধ'-এর সরকারী স্বীকৃতি দেয়া হবে।

মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ: মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

গ. জনপ্রশাসন

'মেরিটোক্রেসির বাংলাদেশ' বিনির্মাণ: মেধা, সততা, সৃজনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ, বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হবে। কেউ যাতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত না হয়, সেটাও নিশ্চিত করা হবে।

স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পাঁচ লক্ষ সরকারি কর্মচারি নিয়োগ: সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থায় প্রায় পাঁচ লক্ষের অধিক সরকারি কর্মচারীর পদ শূন্য আছে। যতদ্রুত সম্ভব সম্পূর্ন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার ভিত্তিতে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের সকল শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হবে।

পে-স্কেল: যথাসময়ে নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা হবে।

'প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন' গঠন: বিএনপি মনে করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ যথেষ্ঠ নয়। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিষেবা ও জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য, অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন' গঠন করে জনপ্রশাসন সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন গঠন: দক্ষ, মেধাবী, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তোলা হবে। মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ সংস্কার করা হবে। সংবিধানের আলোকে একটি যথোপযুক্ত সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন করা হবে। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে ই-গভার্ন্যান্স চালু করা হবে। জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

শক্তিশালী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন: পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে নিয়মিত দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাধারণ (অন্য সকল সেক্টরে) নিয়োগের জন্য যথোপযুক্ত ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে।

বেসরকারি সার্ভিস রুল প্রণয়ন: বেসরকারি চাকুরিজীবীরা যাতে প্রাপ্য ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য বেসরকারি সার্ভিস রুল প্রণয়ন করা হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ: বিগত দিনগুলোতে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। এ কারণেই ব্যক্তির বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং দলীয় আনুগত্যকে বিবেচনায় না নিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে কেবলমাত্র সততা, দক্ষতা, মেধা, যোগ্যতা, দেশ-প্রেম ও অভিজ্ঞতার বিচার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রশাসন, পুলিশ এবং সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বিএনপি।

ঘ. বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ: বাংলাদেশের সংবিধান ও মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর ও স্বতন্ত্র স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

মামলার জট হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি হয়রানিমুক্তকরণ: প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে মামলার জট কমিয়ে আনা হবে। মানুষ যাতে বিচারপ্রাপ্তিতে বৈষম্য ও অযথা বিলম্বের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে।

দুর্নীতিমুক্তকরণে বিচারসেবার আধুনিকায়ন: দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিচার প্রশাসন ও বিচার প্রক্রিয়াকে পূর্ণ ইলেকট্রনিক/অনলাইন ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করা হবে।

'বিচারপতি নিয়োগ আইন' প্রণয়ন: দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে কেবলমাত্র জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নীতিবোধ, বিচারবোধ ও সুনামের কঠোর মানদণ্ডে যাচাই করে বিচারক নিয়োগ করা হবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের জন্য সংবিধানের ৯৫(২)(গ) অনুযায়ী 'বিচারপতি নিয়োগ আইন' প্রণয়ন করা হবে।

'জুডিশিয়াল কমিশন' গঠন: বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি 'জুডিশিয়াল কমিশন' গঠন করা হবে। অধস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হবে। বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পৃথক সচিবালয়কে আরো শক্তিশালী করা হবে।

'সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা: সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অভিশংসন প্রশ্নে সংবিধানে বর্ণিত ইতোপূর্বেকার 'সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং আরো শক্তিশালী করা হবে। এলক্ষ্যে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ফ্যাসিস্ট আমলে বাতিল করা হয়েছিল।

ঙ. পুলিশ

সেবাবান্ধব পুলিশ গঠন: পুলিশ বাহিনীকে একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে। জনবান্ধব ও সেবাবান্ধব পুলিশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশের মোটিভেশন, ট্রেইনিং ও নৈতিক উন্নয়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সিআরপিসি, পিআরবি, পুলিশ আইন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী পুলিশের উপর বিচার বিভাগীয় তদারকি নিশ্চিত করে জবাবদিহি, দায়িত্বশীল ও কল্যাণমূলক পুলিশ প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।

পুলিশের নৈতিক মনোবল পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনআস্থা অর্জন: বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার অবৈধ ক্ষমতা প্রলম্বিত করার লক্ষ্যে পুলিশকে হাতিয়ার হিসেবে যথেচ্ছা ব্যবহার করেছে। ফলে, জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার রোষ ও আস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়া পুলিশের নৈতিক অবস্থান ভেঙ্গে পড়েছে। পুলিশের নৈতিক মনোবল পুনরুদ্ধার করে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অন-লাইন অভিযোগ-দায়ের সুবিধা সম্প্রসারণ: কেবল জিডিই নয় দেশব্যাপী থানাগুলোতে অন-লাইন পদ্ধতিতে অভিযোগ দায়েরের সুযোগ সৃষ্টি করে ফৌজদারি বিচার প্রার্থীদের প্রকৃত অর্থে আইনের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা হবে।

'পুলিশ কমিশন' আইন পুনঃনিরীক্ষণ: 'পুলিশ কমিশন' আইন পুনঃনিরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনমত সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের মাধ্যমে আধুনিক ও কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। পুলিশের দায়িত্ব পালনে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে।

স্থানীয় সরকার

বিএনপি বিশ্বাস করে, স্থানীয় সরকার হল গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র রাজধানী-কেন্দ্রিক না রেখে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় নেতৃত্বের হাতে দায়িত্ব প্রদান করা হলে জনমুখী, কার্যকর ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। উন্নয়ন কার্যক্রম, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ জনগণের জন্য পরিষেবা প্রদানে স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে ক্ষমতায়িত করে স্থানীয় সমস্যা স্থানীয় পর্যায়েই সমাধান করা এবং জনগণকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সেবা প্রদানই বিএনপির লক্ষ্য।

স্থানীয় সমস্যা স্থানীয় পর্যায়েই সমাধান নিশ্চিতকরণ: ঢাকার সচিবালয় থেকে দেশ শাসন করা হবে না। দেশ চলবে তৃণমূলের জনগণের ইচ্ছায় ও মতামতের ভিত্তিতে। যেখানে সমস্যা সেখানেই সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। 'স্থানীয় নেতৃত্বেই টেকসই সমাধান সম্ভব' -এ নীতির ভিত্তিতে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতায়িত করা হবে। ক্ষমতা ও উন্নয়নের ভরকেন্দ্র হবে গ্রামমুখী।

শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসন গঠন: ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষি কার্ডের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি উপযুক্ত শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসন গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থবহ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে। স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি, মৃত্যুজনিত কারণ কিংবা আদালতের আদেশে পদশূন্য না হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হবে না। আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নির্বাহী আদেশ বলে সাসপেন্ড/বরখাস্ত/অপসারণ করা হবে না।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও খবরদারিমুক্তকরণ: স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কোনো জনপ্রতিনিধির খবরদারিমুক্ত স্বাধীন স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করা হবে।

পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ: সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা এবং বৈষম্য নিরসনের জন্য জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ স্থানীয় সরকারের অনুকূলে বরাদ্দ করা হবে। আইন দ্বারা গঠিত একটি স্বাধীন কমিশন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করবে। স্থানীয় সরকারের আয় বৃদ্ধিতে কর ও রাজস্ব সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা: স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হবে ।

বছরে ন্যূনতম একবার উন্নয়ন কাজের উন্মুক্ত সভা আয়োজন: ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে বছরে অন্তত একবার উন্নয়ন কাজের উন্মুক্ত সভা আয়োজন করা হবে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও তৃণমূল জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার আওতায় আসবেন।

বিলবোর্ডের মাধ্যমে স্থানীয় সেবার উন্মুক্ত তথ্য প্রদান: স্থানীয় সরকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধীন সকল সেবা (যেমন: ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিএফ, প্রতিবন্ধিভাতা ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্ত স্থানে বিলবোর্ড আকারে]জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলবাজি কমবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন

দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশের চার কোটি ১৭ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত। দারিদ্র্যের হার প্রায় ২৮ শতাংশ, অতি– দারিদ্র্য প্রায় দ্বিগুণ। বিএনপি মনে করে, দারিদ্র্য কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়; এটি একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংকট। দেশের প্রায় ৫৩ লাখ বিধবা নারী, ৪৬ লাখ প্রতিবন্ধী, অসংখ্য নারীপ্রধান পরিবার, ঋণে নিমজ্জিত পরিবার, দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এবং খাদ্য–নিরাপত্তাহীন মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী ও টেকসই নয়। এজন্য বিএনপি মানবিক, ন্যায়সঙ্গত ও মর্যাদাভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছে, যেখানে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে। বিএনপি পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে দিবে 'ফ্যামিলি কার্ড' এবং কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মৎস্যচাষী ও প্রাণিসম্পদ খামারীদের 'কৃষক কার্ড' প্রদান করবে।

সামাজিক সুরক্ষার আওতা সম্প্রসারণ ও স্বচ্ছতা আনয়ন: সামাজিক সুরক্ষা খাতের বিদ্যমান আওতা সম্প্রসারণ করা হবে। সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ অন্য কোনো খাতে নয়, শুধুমাত্র এই খাতের আওতাভুক্ত খাতগুলোতেই ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এই খাতে দ্বৈতভাতা ও অন্যান্য অনিয়ম দূর করে স্বচ্ছতা আনয়ন করা হবে।

সামাজিক সুরক্ষা খাতে সুশাসন বাস্তবায়ন: সামাজিক সুরক্ষা খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে। বিশেষ ভাতা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও ত্রুটিমুক্ত করা হবে। সামাজিক সুরক্ষা সেবার উপকারভোগী নির্বাচন থেকে বাস্তবায়ন ও নজরদারি পর্যন্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের হাতে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে। সব নগদ আর্থিক সহায়তা নারীর অথবা পরিবারের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে।

ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি: সকল দুঃস্থ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা এবং অসহায় বয়স্কদের ভাতার পরিমাণ মূল্যস্ফীতির নিরিখে বৃদ্ধি করা হবে। প্রবীণ পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

'পেনশন ফান্ড'গঠন: বেসরকারি খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য বার্ধ্যক্যের দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে পেনশন প্রদানের লক্ষ্যে 'পেনশন ফান্ড' গঠন করা হবে।

দারিদ্র্য-পীড়িত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি: বাংলাদেশের দারিদ্র্য-পীড়িত, দুঃস্থ ও পশ্চাৎপদ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং অবকাঠামোগত সুযোগবঞ্চিত এলাকাগুলো তৃণমূলে জরিপের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে এসব এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিবন্ধী মানুষবান্ধব জাতীয় নাগরিক সেবা গড়ে তোলা: বাস-ট্রেনে-লঞ্চে বিনা ভাড়ায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের যাতায়াতের বিধান করা হবে। প্রতিবন্ধী মানুষবান্ধব জাতীয় নাগরিক সেবা গড়ে তোলা হবে।

পিতামাতার ভরণপোষণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন: জন্মদাতা মা-বাবাকে নির্যাতন ও বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর দুঃখজনক প্রবণতা নিরোধকল্পে পিতা মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ পর্যালোচনা করে এর দুর্বলতাগুলি দূর করা ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান: সমাজের অবহেলিত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে (যেমন: তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, বেদে ইত্যাদি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা হবে। ভাসমান ও আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। গৃহকর্মী ও গিগ ওয়ার্কারদের (যেমন: ফ্রিল্যান্সার, ফুডপাণ্ডা, উবার, পাঠাও-এর চালক ইত্যাদির কাজে সম্পৃক্ত কর্মী) জন্য আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে শতভাগ সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার প্রয়াস নেয়া হবে।

হতদরিদ্র এতিম শিশুদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন: হতদরিদ্র এতিম শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভরণপোষণ তহবিল গঠন ও তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করা হবে।

আসন্ন লংজেভিটি ডিভিডেন্ডের সুবিধা অর্জনে অগ্রাধিকার: ২০৪০ সাল ও তার পরবর্তী সময়কালে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাদেরকে অবহেলা না করে, বরং তাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা, স্বেচ্ছাব্রতী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখা এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় রাখা হবে এবং তাদের উন্নয়ন সাধন করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন

বিএনপি বিশ্বাস করে, দেশের উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া অসম্পূর্ণ। নারী অধিকার, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় অর্জন সহজ হবে। বিএনপি নারীদের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সুরক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজে তাদের সম্পৃক্ততা এবং ক্ষমতাকে দৃঢ় করবে। দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য বিএনপি সকল কর্মকাণ্ডে নারী সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করবে।

পরিবারের নারী প্রধানের নামে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান: প্রায় ৪ কোটি প্রান্তিক পরিবারের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করা হবে। এই কার্ড মূলত পরিবারের নারী প্রধান যথা আমাদের মা ও বোনদের নামে ইস্যু করা হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে বিএনপি সরকার দিবে প্রতি মাসে ২,০০০ – ২,৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা অথবা খাদ্য সুবিধা যথা: চাল, ডাল, তেল, লবণ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। অর্থ সেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা

হবে। এই কার্ড হবে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি ও নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার নিশ্চয়তা। বেগম খালেদা জিয়া নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন, এখন বিএনপি তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে চায়।

স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা: নারী শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। মেয়েদের জন্য একাডেমিক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে, যাতে গ্রাম বা শহর, যেখানেই হোক, প্রতিটি মেয়ে দক্ষতা অর্জন করে নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে। উল্লেখ্য যে, বেগম খালেদা জিয়া এদেশে নারী শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ: নারীদেরকে পরিবার ও সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রে রাখা হবে। স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও সুন্দর মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি মেয়ে যে স্বপ্ন দেখে, তার সেই স্বপ্নপূরণের পথে রাষ্ট্র যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সেদিকে নজর দেওয়া হবে।

নীতিনির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি: তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীর নেতৃত্ব বিকাশ নিশ্চিত করা হবে এবং রাজনীতি, প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে।

প্রজনন ও মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বৃদ্ধিকরণ: নারীদের চলাফেরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার শক্তিশালী করা, সাংস্কৃতিক বাধা দূর করা, প্রান্তিক নারীদের অন্তর্ভুক্তি করা, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার পরিসর বৃদ্ধি করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

লিঙ্গ-ভিত্তিক ও অনলাইন সহিংসতা, বিদ্বেষ এবং বুলিং নিরোধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ: নারীর প্রতি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নিরসন করা, নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব বৃদ্ধি করা হবে। ডিজিটাল/অনলাইন সহিংসতা, বিদ্বেষও বুলিং বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে এবং কার্যকর আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীদের ডিজিটাল হয়রানি বন্ধ করা হবে।

ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বাস্তবায়ন: নারীর নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, এসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচাররোধে কঠোর কার্যকর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ধর্ষক ও নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশেষায়িত 'নারী সাপোর্ট সেল' প্রতিষ্ঠা: ইউনিয়ন পর্যায়ে নারীদের জন্য বিশেষায়িত 'নারী কল্যাণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব কেন্দ্রে নারী চিকিৎসক, আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মীরা ভুক্তভোগী নারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বিত সহায়তা প্রদান করবেন।

নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও দক্ষতা সহায়তা প্রদান: স্বনির্ভরতা বাড়াতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের বিনাসুদে সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা ও কর-ছাড় দেয়া হবে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ডেভেলপমেন্ট ও মার্কেটিং সাপোর্ট প্রদান করা হবে।

আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ: শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক খাতে নারীর কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করা হবে। নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সন্তানদের শিক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম করা সম্ভব হবে।

কর্মস্থলে 'ডে-কেয়ার' ও 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার' স্থাপন: নারীদের কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র (ডে-কেয়ার) স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, গার্মেন্টসসহ সব শিল্প কারখানা, অফিস ও আদালতে কর্মরত মায়েদের জন্য 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার' স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে, যেখানে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে মা তার নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন।

স্বাস্থ্য ও হাইজিনের জন্য 'ভেন্ডিং মেশিন' স্থাপন: মাধ্যমিক, মাদ্রাসাসহ সকল সমমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সেনিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে, এই সেবা সকল সরকারি ও বেসরকারি শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিস্তৃত করা হবে।

কৃষক, কৃষি উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য

ক. কৃষক ও কৃষি উন্নয়ন

কৃষি বাংলাদেশের জীবনরেখা। ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও পশু পালনের মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কোটি মানুষের জীবিকা রক্ষা এবং অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহারের কারণে কৃষি খাত দীর্ঘদিন ধরে তার সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হতে পারেনি। বিএনপি কৃষি খাতের মৌলিক রূপান্তরে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিএনপির লক্ষ্য হলো—আত্মনির্ভর, জলবায়ু-সহিষ্ণু, প্রযুক্তিনির্ভর ও কৃষক-কেন্দ্রিক একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদন ও বিপণন হবে ডেটা-চালিত, কৃষক হবেন ক্ষমতায়িত উদ্যোক্তা এবং কৃষি খাত জাতীয় সমৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হবে।

কৃষক কার্ড ও কৃষকের সার্বিক সুরক্ষা: কৃষকের জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য কৃষক কার্ড প্রদান করা হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং স্বল্প মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সুবিধা পাওয়া যাবে। পাশাপাশি, স্বল্প ব্যয়ে সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষি ঋণ, কৃষি বীমা সুবিধা, ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে। তাছাড়া, কৃষক কার্ড দিয়ে মোবাইলে আবহাওয়া ও বাজার তথ্য, মোবাইলে ফসলের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যাবে। মৎস্যচাষী ও প্রাণিসম্পদ খামারীরাও কৃষক কার্ডের সুবিধা পাবেন। এর পাশাপাশি, কৃষি খাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এই সহায়তা পাবেন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ডাটা বেইস গড়ে তুলে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাওয়ার যোগ্য প্রকৃত কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদসহ কৃষি ঋণ মওকুফ: সার, বীজ, তেল, বিদ্যুৎ, সেচের পানিসহ কৃষি উপকরণের দাম বেড়েই চলছে। কিন্তু খেটে খাওয়া কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিষপত্রের দাম ফ্যাসিস্ট আমল থেকে দ্রুত বেড়েই চলেছে। জনজীবনে কোনো স্বস্তি নাই। জনগণের সরকার হিসাবে শস্য, ফসল, মৎস্য, ও পশুপালন খাতে গৃহীত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদ সহ মওকুফ করা হবে। উল্লেখ্য যে, বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ-আসল মওকুফ করা হয়েছিল, যা কৃষকদের কষ্ট লাঘব করে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

ক্ষুদ্র ঋণের এক বছরের কিস্তি সরকার কর্তৃক পরিশোধ: মূল্যস্ফীতির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে এই কঠিন সময়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ এর কিস্তি শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বিএনপি সরকার গঠন করলে নিবন্ধিত এনজিওদের কাছে থেকে নেয়া ক্ষুদ্রঋণের এক বছরের কিস্তি ক্ষুদ্র ঋণগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে সরকার এনজিওদেরকে প্রদান করবে। এই সাশ্রয়ে জীবন সহনীয় হবে। এই সাশ্রয় দিয়ে চাহিদামত পুষ্টিকর খাবারসহ অন্যান্য চাহিদা মেটানো যাবে ।

বরেন্দ্র প্রকল্প পুনঃচালুকরণ ও আম সংরক্ষণে বিশেষ হিমাগার স্থাপন: বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বরেন্দ্র প্রকল্প পুনরায় চালু করা হবে। বরেন্দ্র অঞ্চলের খালগুলো খনন করা হবে। যথাযথভাবে আম সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বিশেষ হিমাগার' স্থাপন করা হবে।

ফসলের ন্যায্যমূল্য ও কৃষিজমি সুরক্ষা এবং ক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ: কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে। কৃষকদের হাতকে শক্তিশালী ও টেকসই করার জন্য সঠিক বাজারজাতকরণ নীতি প্রণয়ন করা হবে। পাশাপাশি, উচ্চমূল্য ও উচ্চফলনশীল ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা হবে এবং তথ্যভিত্তিক টার্গেটেড পলিসি সাপোর্ট প্রদান করা হবে। কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয়ের জন্য সরকারি ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং দেশব্যাপী কোল্ড স্টোরেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

কৃষি বীমা ব্যবস্থা: প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের ঝুঁকি হ্রাস এবং কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও শস্য বীমা, পশু বীমা, মৎস্য বীমা এবং পোল্ট্রি বীমা চালু ও সম্প্রসারণ করা হবে।

খাল খনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত 'স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচি' পুনঃবাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশপ্রেমী জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ২০,০০০ কিলোমিটার নদী ও খাল খনন, পুনঃখনন ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে হারিয়া যাওয়া ৫২০ টি নদী, হাজার হাজার খাল এবং তাদের প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ পুনরুদ্ধার ও সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্য রপ্তানি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা: উত্তরাঞ্চলের কৃষি-নিবিড় জেলাগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষায়িত কৃষি পণ্য রপ্তানি অঞ্চল গড়ে তুলে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন, উত্তরাঞ্চলের মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান ও সে অঞ্চলের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

'এগ্রোপ্রেনারশীপ' স্টার্ট-আপ প্রকল্প গ্রহণ: তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে 'এগ্রোপ্রেনারশীপ' স্টার্ট-আপ প্রকল্প গ্রহণ এবং 'কৃষি উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম' গঠন করা হবে।

অঞ্চলভিত্তিক কৃষি পণ্য উৎপাদন ও গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান: যে অঞ্চলে যে ফসল ভালো হয়, সে অঞ্চলে সেই ফসল চাষের টার্গেটেড পলিসি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু, কম পানির ফসল, দ্রুত পাকার জাতসহ আধুনিক কৃষি গবেষণা জোরদার করা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী করা এবং কৃষি গবেষণায় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

প্রিসিশন এগ্রিকালচার: আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যনির্ভর 'প্রিসিশন এগ্রিকালচার' চালু করে উৎপাদন খরচ কমানো ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা হবে। সুষম, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রণোদনার মাধ্যমে গোটা কৃষি খাতকে পুনর্বিন্যাস ও বিকশিত করা হবে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কৃষি: চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে কৃষিকে আধুনিক, দক্ষ ও টেকসই খাতে রূপান্তরের লক্ষ্যে রিমোট সেন্সিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন ও ন্যানো প্রযুক্তি কৃষিতে প্রয়োগ করা হবে। বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে জৈব সার ও বায়োচার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্প্রসারণ করে মাটির গুণাগুণ উন্নয়ন ও রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমানো হবে। কৃষির যান্ত্রিকীকরণে সরকারি প্রণোদনা, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা জোরদার করা হবে, যাতে সময়, শ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় হয়।

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা: জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় কৃষিকে টেকসই, আধুনিক ও জলবায়ু-সহিষ্ণু ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সমবায় পুনরুজ্জীবন: সমবায় খাতকে পুনরুজ্জীবিত করে এলাকা ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণনের ওপর বিশেষায়িত কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। কৃষিখাতে উৎপাদন ও লাভ বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক সমবায় কৃষি ব্যবস্থা সম্প্রসারনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

প্রাণিসম্পদ খাত উন্নয়ন: হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামারের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত 'ফিড' উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রতি উপজেলায় পর্যাপ্ত পশু-রোগ প্রতিষেধক ঔষধের যোগান নিশ্চিত করা এবং পশু-রোগ চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হবে। দেশের পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে নীতি সহায়তা ও সরকারি প্রণোদনা দেয়া হবে। এই খাতে নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তা, প্রবাসী উদ্যোক্তাসহ সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারীদের ঋণ সহায়তা প্রদান ও সরকারিভাবে পশু চিকিৎসা সহায়তা জোরদার করা হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলের মাধ্যমে ফিড উৎপাদন ও 'ভ্যাক্সিন প্ল্যান্ট' স্থাপনের প্রয়াস নেয়া হবে।

মৎস্য খাত উন্নয়ন: জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে এগুলো 'জাল যার জলা তার' এই নীতির ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে। জেলেদের মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থান ও খাদ্য সহায়তা জোরদার করা হবে। উন্নত মাছের প্রজাতি উদ্ভাবন, মানসম্মত ফিড উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেওয়া হবে। রোগমুক্ত পোনা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, হ্যাচারিগুলোতে পিসিআর ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি করা, মৎস্যচাষীদের বিজ্ঞানসম্মত অ্যাকুয়াকালচার গ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্রান্ড তৈরি এবং বিদেশে সুপারশপগুলোতে মানসম্মত সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুগম করে এই খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

খ. নিরাপদ খাদ্য

বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপদ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন হবে জাতীয় অগ্রাধিকার খাত।

ভেজাল প্রতিরোধ: ভেজাল প্রতিরোধ, বিশেষ করে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল রোধে মনিটিরিং ব্যবস্থা জোরদার ও আইনি ব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মনিটরিং বৃদ্ধি: দেশব্যাপী নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, নকল ও ভেজাল খাদ্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণণরোধে নিরপাদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআইসহ নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো সক্ষম করতে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ, মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক তদারকি বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনের গুরুত্বারোপ: নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে কৃষক পর্যায় থেকে গুরুত্বারোপ করা হবে। এক্ষেত্রে জৈব কৃষি, নিরাপদ সার এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্বারোপ করা হবে। পাশাপাশি, ভোক্তা পর্যায়েও সচেতনা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং হিমাগার স্থাপন: দেশজুড়ে ফল ও সবজির পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং হিমাগার স্থাপন করা হবে, যাতে পচন ও অপচয় কমে, কৃষক লাভবান হয়, এবং ভোক্তারা পায় নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর খাদ্য। কৃষক ও বাজারের সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলা হবে।

'খাদ্য ও ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' গঠন: একটি শক্তিশালী ও কার্যকর 'খাদ্য ও ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

খাদ্য আমদানিতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন: খাদ্য আমদানি প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে খাদ্য আমদানি কমিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।

দেশব্যাপি কর্মসংস্থান

বেকারত্ব বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের লুটপাট, চরম অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও লাগামহীন দুর্নীতির ফলে দেশে বেকারত্ব, বিশেষত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ২৭ লাখের বেশি, যার মধ্যে প্রায় ৯ লাখ স্নাতক ডিগ্রীধারী উচ্চশিক্ষিত বেকার রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ২২% তরুণ-তরুণী কোনো প্রকার শিক্ষা, চাকুরি ও প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত নয়। এই বিশাল সংখ্যক বেকারের অধিকাংশই ১৫-২৯ বছর বয়সের তরুণ-তরুণী।

'করবো কাজ, গড়বো দেশ' নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন - বিএনপি'র প্রথম ও প্রধান অগ্রাধিকার। ধারাবাহিকভাবে, দেশের অর্থনীতির সার্বিক সংস্কার, খাত ও অঞ্চলভিত্তিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে এবং শিল্পে-বাণিজ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে দেশব্যাপী এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালুকরণ: বেকার ও চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য কর্মসংস্থান প্ল্যাটফর্ম গঠনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থা চালু করা হবে। এখানে চাকুরী প্রত্যাশীরা নিবন্ধন করবেন। চাকুরী প্রত্যাশীদের দক্ষতা ও অন্যান্য যোগ্যতার সাথে ম্যাচিং প্রক্রিয়ায় যোগ্য বেকারদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। যাদের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, তাদেরকে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে (কারিগরি ও অন্যান্য) প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। একই সাথে যুবসমাজকে মাদকের রাহু গ্রাস থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে চাকুরী প্রার্থীদেরকে ডোপটেস্ট প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হবে।

বেকারভাতা প্রদান: শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের জন্য ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত অথবা কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত (যা আগে ঘটবে ভিত্তিতে) বিশেষ আর্থিক ভাতা প্রদান করা হবে।

সবার জন্য ইন্টারনেট সুবিধা: কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসা, হাইস্কুল, সরকারি অফিস, গ্রামীণ ডিজিটাল সেন্টার, হাসপাতাল, রেলস্টেশন ও বিমানবন্দরসহ নির্দিষ্ট জনবহুল স্থানে বিনামূল্যে ইন্টারনেট চালু করে তথ্যের আদান-প্রদান, আধুনিক সেবা গ্রহণ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম আরও সহজ করা হবে।

বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ভাষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ: দেশব্যাপী বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ চালু করা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বছরে ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করা, এবং বিদেশ গমনের জন্য বিনাসুদে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

চাহিদাভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা: দেশব্যাপী টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং-এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন করে দক্ষতা-নির্ভর কর্মসংস্থান, হাতে-কলমে প্রযুক্তি শিক্ষা, শিল্প-কারখানায় সরাসরি ট্রেনিং, বাস্তবতানির্ভর প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন চালু করা হবে, যাতে তরুণ-তরুণীরা দেশীয় শিল্প, এবং বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরির জন্য প্রস্তুত হয়ে সরাসরি কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারে। এদের একটা অংশ স্বনিয়োজিত কর্মেও নিয়োজিত হতে পারবেন।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও ক্যারিয়ার সেন্টার: সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান, - এবং ক্যারিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার লক্ষ্য ক্যাম্পাসভিত্তিক জব ইন্টারভিউ, ইন্টার্নশিপ ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আয়োজন, এবং শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক তৈরি করা।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা: প্রত্যেক জেলার ঐতিহ্য ও বিখ্যাত পণ্যের ভিত্তিতে কুটির শিল্প ও এসএমই খাত বিকাশে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে বেসরকারি শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়ক উদ্যোগ নেওয়া, এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা স্বচ্ছ, দলীয়করণমুক্ত ও ব্যবসাবান্ধব করা হবে।

মেধাভিত্তিক সরকারি নিয়োগ: বিসিএস এবং সব সরকারি নিয়োগে মেধা ও যোগ্যতার ন্যায্য মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হবে, যেন সকল বৈষম্য ও দলীয় প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া গড়ে উঠে। পাশাপাশি, গণ- আকাঙ্ক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে সরকারি চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে নতুন শিল্প: সাইবার নিরাপত্তা, আউটসোর্সিং, ডাটা প্রসেসিং, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, সেমিকন্ডাক্টরসহ আইটি সেক্টরে নতুন শিল্প গড়ে তুলে প্রতি বছর সরাসরি দুই লক্ষ, এবং ফ্রিল্যান্সিং, ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি ও কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আট লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি: ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, শিল্পায়ন, আইটি, অবকাঠামো, পরিবেশ ও জ্বালানিসহ সব খাতে বিএনপির পরিকল্পিত প্রোগ্রাম ও প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে লক্ষ-লক্ষ

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

রপ্তানি খাতের বৈচিত্র্য: সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও আইসিটি শিল্প শক্তিশালী করার পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক পণ্য, ঔষুধ, চামড়া ও জুতা, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইত্যাদি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে রপ্তানি খাতকে বৈচিত্র্যময় করা হবে। তৈরি পোশাক শিল্পে নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে 'মেড ইন বাংলাদেশ'-কে বৈশ্বিক বাজারে আরো শক্ত অবস্থানে তুলে ধরা হবে, যেন প্রতিটি সেক্টরে কর্মসংস্থানের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ ও উদ্যোক্তা সহায়তা: তরুণ প্রজন্মের জন্য দেশব্যাপী ও ক্যাম্পাসভিত্তিক উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা আয়োজন, বিজয়ীদের স্টার্ট-আপ ফান্ড, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, এবং স্থানীয় ইকোনমিক জোন, ইপিজেড, বিসিক, হাই-টেক ও সফটওয়্যার পার্কের অব্যবহৃত স্থানে উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা বরাদ্দ করা হবে।

ব্যবসা সহজ করার পরিবেশ: কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেন্দ্রিক বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানো, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট সহজ করা, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু থেকে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ডিজিটাল ও হয়রানিমুক্ত ওয়ান-স্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করা হবে।

ট্যাক্স ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও উৎসাহ: সৎ ব্যবসা ও উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন করতে ট্যাক্স কাঠামো যৌক্তিক করা, যুব ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ট্যাক্স ছাড় ও ইনসেনটিভ প্রদান, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভ্যাট হ্রাস, এবং ডিজিটাল সেবা ও স্বচ্ছ অডিট ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা হবে।

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ উৎসাহ: দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করতে প্রক্রিয়া সরলীকরণ, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় সিন্ডিকেট ভেঙে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, জেলা পর্যায়ে বিনিয়োগ সেন্টার গড়ে তোলা, প্রবাসীদের জন্য বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা, এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা চালু বৃদ্ধি হবে।

আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সুবিধা: ফ্রিল্যান্সার ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য পেপালসহ আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করে বৈশ্বিক অর্থ লেনদেন, কেনাকাটা, বিল ও ফি ডিজিটালভাবে সহজ করা হবে। বাংলাদেশ ও বিদেশের ব্যাংকের মধ্যে সকল ব্যবসার নিয়মতান্ত্রিক পেমেন্ট ও মানি ট্রান্সফার সুবিধাজনক করা হবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান: গ্রামের শিক্ষাহীন, গৃহিনী, প্রবীণ, ও দীর্ঘমেয়াদী বেকারদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম চালু করা হবে, যার মধ্যে থাকবে হাঁস, মুরগী ও পশুপালন, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কম্পিউটার ও ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ, এবং তাদের সুলভ হারের মাইক্রো-ক্রেডিট ও সরঞ্জাম সহায়তা প্রদান করা হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সহযোগিতা: রিকশাচালক, দিনমজুর, হকার, ফুটপাথ ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক, নিরাপত্তাকর্মী, হরিজন, ইত্যাদি তথা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা ও যৌক্তিক মজুরি নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে দৈনন্দিন আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সমঅধিকার ও অন্তর্ভুক্তি: বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গ, দলিত, আদিবাসী, এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি ও বেসরকারি খাতকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে বাস্তবমুখী নীতি প্রণয়ন করা হবে।

যুব উন্নয়ন

বিএনপি বিশ্বাস করে, দেশের ভবিষ্যৎ এবং জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করছে দক্ষ, স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল যুবশক্তির উপর। বিএনপি তরুণ ও যুবকদের এমনভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে চায়, যেন তারা আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল ও নাগরিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়ে দেশের অর্থনীতি ও সমাজে অবদান রাখতে পারে। যুব উন্নয়নে বিএনপি মূলত কারিগরি শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা, উদ্যোক্তা উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ সুযোগ সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দেবে।

আইটি পার্কগুলোতে অফিস স্পেস ও ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা প্রদান: দেশের আইটি পার্কগুলোতে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ছোট ছোট অফিস স্পেস ও ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা দেওয়া হবে। ফ্রিল্যান্সার ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য পে'পাল-সহ আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করা হবে।

ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সাইবার নিরাপত্তা, আউটসোর্সিং, ডাটা প্রসেসিং, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, সেমিকন্ডাক্টরসহ আইটি সেক্টরে নতুন শিল্প গড়ে তুলে সরাসরি দুই লক্ষ, এবং ফ্রিল্যান্সিং, ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি ও কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আট লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

এসএমই ঋণ প্রদান ও অ্যামাজন, আলিবাবায় সংযুক্তকরণ: প্রত্যেক জেলার ঐতিহ্যবাহী ও বিখ্যাত পণ্যের ভিত্তিতে কুটির শিল্প ও এসএমই খাত বিকাশে বিনাসুদে ঋণ প্রদান, বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও স্টার্ট-আপ ফান্ড এবং যুব দক্ষতা উন্নয়ন অগ্রাধিকার প্রদান: যুব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পেশা যেমন: প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক কাজ, অটোমোবাইল মেরামত, ইলেকট্রনিক্স অ্যাসেম্বলি, ডেটা এন্ট্রি, গ্রাফিক ডিজাইন, কোডিং, এআই, সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিক্স, নার্সিং, কেয়ারগিভিং, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, হাউসকিপিং, ফ্রন্ট ডেস্ক, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজম্যান্ট, খাদ্য ও পানীয় সেবা, ভ্রমণ সহায়তা এবং পেশাদার ড্রাইভিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে। বিদেশি ভাষা শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ, বিদেশে যেতে ঋণ ও স্টার্ট-আপ ফান্ড গঠন করা হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি: মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যারিয়ার পোর্টাল ও জব ম্যাচিং সেবা চালুকরণ: কোর্সেরা, গুগল, মেটা ইত্যাদির সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ড্যাশবোর্ড, ক্যারিয়ার পোর্টাল, জব ম্যাচিং ও মাইক্রোলার্নিং সেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জাতীয় ডিজিটাল স্কিলস অথরিটি গঠন: ডিজিটাল কর্মশক্তির উন্নয়ন এবং ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়নে 'জাতীয় ডিজিটাল স্কিলস অথরিটি' গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে। বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন সব সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে খাত-ভিত্তিক কোর্স বা পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। পাশাপাশি, খাত-ভিত্তিক স্কিলস কাউন্সিল গঠন (গার্মেন্টস,

আইসিটি, লজিস্টিকস, পর্যটন, কেয়ারগিভিং) করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ও আসন্ন লংজেভিটি ডিভিডেন্ডের সুবিধা অর্জনে অগ্রাধিকার: বাংলাদেশে জনসংখ্যার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে বিএনপি বদ্ধপরিকর। একদিকে, ১৫-৬৪ বছরের কর্মক্ষম জনশক্তির জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা রয়েছে, যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এই , কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বাজারভিত্তিক দক্ষতা ও কর্মসংস্থান ও ব্যাপক কর্মমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে কর্মক্ষম জনসম্পদের ইতিবাচক সম্ভাবনা ও লভ্যাংশ দ্রুত আদায় নিশ্চিত করা হবে। অন্যদিকে, ২০৪০ সাল ও তার পরবর্তী সময়কালে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাদেরকে অবহেলা না করে, বরং তাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা, স্বেচ্ছাব্রতী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখা এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিএনপি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী এবং সময় উপযোগী করে গড়ে তুলবে। বিএনপি'র শিক্ষানীতি হবে জীবনমুখী। শিক্ষার সকল স্তরে জোর প্রদান করা হবে, তবে প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে বেশি। মৌলিক মূল্যবোধ শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হবে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করে নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

শিক্ষাখাতে জিডিপি'র পাঁচ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ প্রদান: শিক্ষাখাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপি'র পাঁচ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এই অর্থ কেবল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে, বিশেষকরে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের শিক্ষাদানের মান ও দক্ষতার ওপর জোর দেয়া হবে। তাঁদের যথাযথ ট্রেনিং দেওয়া হবে। প্রযুক্তি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাসামগ্রীর উন্নয়নে জোর দেয়া হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের শিক্ষকদের আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা অর্জনসহ সার্বিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্যাবলেট কম্পিউটার প্রদান করা হবে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন: শিক্ষামূলক ছবি, ভিডিও, ডকুমেন্টারি ও অনলাইন কনটেন্টের মাধ্যমে কারিকুলাম ও নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে।

লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস (আনন্দময় শিক্ষা): ক্লাস সিক্স থেকে দলগত কাজ, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উন্নয়ন (পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট), পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা হবে।

বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষা: দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে বাংলা-ইংরেজির পাশাপাশি আরবি, জাপানিজ, কোরিয়ান, ইতালিয়ান, ম্যান্ডারিন ইত্যাদি তৃতীয় ভাষা শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায় থেকে চালু করা হবে।

সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা: আত্মকর্মসংস্থান এবং দেশ ও বহির্বিশ্বে চাকরির সুযোগ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তুলতে মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। সিলেবাস এমনভাবে সাজানো হবে যেন একটা পরিবার যদি তার সন্তানকে এস.এস.সি কিংবা ইন্টারমিডিয়েটের বেশি না পড়াতে পারে, তাহলে সেই শিক্ষা দ্বারাই যেন সে নিজের জন্য কর্মসংস্থান করে নিতে পারে।

ক্রীড়া ও দেশীয় সংস্কৃতি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি: মননশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার ইত্যাদি খেলা এবং সংগীত, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিষয় পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হবে।

স্বাস্থ্য ও খাদ্যে অগ্রাধিকার: শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সবার জন্য পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ এবং সারাদেশে পর্যায়ক্রমে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য 'দুপুরের খাবার (মিড-ডে মিল)' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সুশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষক: গণিত, বিজ্ঞান, তৃতীয় ভাষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, আইটি ও কারিগরিসহ সকল বিষয়ে মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী করে গড়ে তুলে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যমান সকল ক্যাডার ও নন-ক্যাডার শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব: শিক্ষার সকল স্তরে জোর প্রদান করা হবে, তবে প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে বেশি। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি মৌলিক মূল্যবোধ শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হবে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের আকর্ষণীয় বেতন, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

শিক্ষাখাতে সামাজিক ও ভৌগোলিক বৈষম্য নিরসণ: শিক্ষা ধনিক শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার নয়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার সুযোগকে অনগ্রসর এলাকার জনসাধারণের দ্বার-প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রতিভা অন্বেষণ ও উপযুক্ত সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মোচন করবে বিএনপি।

ফ্রি ওয়াই-ফাই চালু: শিক্ষা খাতে ডিজিটাল সুবিধা বাড়াতে স্কুল, কলেজ, ক্যাফে ও লাইব্রেরিতে ফ্রি ওয়াই-ফাই চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও গবেষণার কাজে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখবে।

'বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস' প্রদান: শিক্ষার্থীদের সরকারিভাবে 'বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস' প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপি'র।

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো: সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় দিবসগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

'শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে 'শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন করা হবে। প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামে ব্যবহারিক এবং কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে ঢেলে সাজানো হবে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের ওপর স্পিকিং টেস্ট চালু করা হবে। দেশের ও প্রবাসী শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করা হবে। মূল লক্ষ্য হবে – প্রাথমিক পর্যায় থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, বহু ভাষা, ক্রীড়া, কৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নসহ বাস্তবানুগ বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

গণঅভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের আহতদের সহায়তা প্রদান: বিগত বছরগুলোতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে যারা শহীদ ও আহত হয়েছেন এবং জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এবং গুরুতর আহত হয়ে অঙ্গহানি ও পঙ্গুত্ব বরণকারী জুলাই শিক্ষার্থী যোদ্ধাদের এবং তাদের শিক্ষার্থী সন্তানদের বিশেষ শিক্ষা প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ: মানসম্মত সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আর্লি চাইল্ডহুড ডেভলপমেন্ট (ইসিডি) নিশ্চিত করা হবে, যাতে শিশুর জ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক বিকাশ শক্ত ভিত্তির উপর গড়ে উঠে। ভালো বই ও ভালো সিলেবাসের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষাকে গুরুত্বারোপ করা হবে। পাশাপাশি, একটি সমন্বিত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষানীতি গ্রহণ করে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সুশাসন ও গুণগত মান নিশ্চিত করা হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের শিক্ষা উন্নয়ন: দৈহিক, মানসিক এবং আবেগগতভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা উপকরণসহ পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

অনন্য ডিজিটাল পরিচয় বা এডু-আইডি প্রবর্তন: প্রতিটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের থাকবে একটি অনন্য ডিজিটাল পরিচয় বা এডু-আইডি এই আইডির মাধ্যমে জানা যাবে কে কতদূর শিখল, কোথায় পিছিয়ে আছে, কোথায় এগিয়ে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হবে।

ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি কর্মসূচি বাস্তবায়ন: শিক্ষার্থীদের একটি সুন্দর এবং ভালো ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথিকৃৎ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএনপি শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করবে। 'ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি (একটি শিশু একটি গাছ)' কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুকে প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হবে।

শিক্ষার্থীদের পোষ্য প্রাণী পালন উৎসাহিতকরণ: প্রতিটি স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ছোট ছোট টিম করে পোষ্য প্রাণী পালনকে উৎসাহিত করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হবে তাদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান উন্নত করা। শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এটি বাস্তবায়ন করা হবে।

গ্রীষ্মের ছুটির কর্মমুখী ব্যবহার: স্কুল-কলেজে গ্রীষ্মের ছুটিকে ভাগাভাগি করে 'কর্মমুখী শিক্ষা' চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পৃথক শিক্ষা চ্যানেল: শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় টিভিতে একটি পৃথক শিক্ষা চ্যানেল চালু করা হবে।

সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা: আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্যটাই হবে যাদের মাঝে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে (যেমন: কেউ কেরাত পাঠে ভালো, কেউ সংস্কৃতির কোনো বিষয়ে ভালো, কেউ অঙ্ক ও ইংরেজিতে ভালো কিংবা কেউ খেলাধুলায় ভালো), এই প্রতিভাবানদেরকে ধীরে ধীরে বের করে নিয়ে আসা এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়া।

সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা সৃষ্টিতে গুরুত্বারোপ: শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা থেকে বের হয়ে গঠনমূলক সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণ: ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারিভাবে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা এবং ফ্রিল্যান্সিং সংক্রান্ত কোর্সসমূহ শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। পাশাপাশি, দেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বাধাহীন প্রবেশ নিশ্চিতে নানাবিধ প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। মাদ্রাসার কারিকুলামে পেশাভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই সংস্কারের আওতায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আইটি এবং ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, যাতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা উৎপাদনশীল কাজ, দেশে-বিদেশে চাকরি, অন্যান্য পেশা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ে। উল্লেখ্য যে বিএনপি সর্বশেষ রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকাকালীন কওমী মাদ্রাসার 'দাওরায়ে হাদিস' সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমান ঘোষণা করে।

কওমী সনদ স্বীকৃতির পূর্ণ বাস্তবায়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাধা দূরীকরণ: কওমী সনদ স্বীকৃতির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে। কওমী সনদধারীদের বিদেশে (যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ) ধর্মীয় উচ্চশিক্ষালাভে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।

সরকারি চাকরির নিয়োগে অগ্রাধিকার: যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ, বিশেষত সরকারি মসজিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক কাম ইমাম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

হাফেজে কুরআনদের সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে সকল হাফেজে কুরআন, ক্বারী এবং আলেম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন, তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মান ও স্বীকৃতির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নতুনকুঁড়ি কোরআন তেলাওয়াত প্রবর্তন: নতুনকুঁড়ি কোরআন তেলাওয়াত প্রবর্তন করা হবে।

গবেষণায় গুরুত্বারোপ: শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষা ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হবে। তথ্য প্রযুক্তিখাতে দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বড় কোম্পানির জন্য কর্পোরেট শিক্ষানবীশ আইন চালু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়–শিল্পখাত যৌথ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আটটি আঞ্চলিক শাখায় বিভক্ত করা হবে। প্রতিটিতে একজন উপ-উপাচার্য নিয়োজিত থাকবেন, যাতে প্রশাসনির ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পাঠক্রম যুগোপযোগী ও শ্রমবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ক্ষমতায়ন: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালী করা হবে, যেন এটি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সার্বিক কৌশলগত নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়কে কর মুক্ত রাখা: বেগম খালেদা জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯১ সনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু হওয়ার পর দেশের উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অসামান্য অবদান রেখে আসছে। বিদেশে ব্রেন ড্রেন রোধ করে একদিকে বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে, অপরদিকে দেশি

প্রতিভা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সম্প্রসারণের স্বার্থে এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান কর মুক্ত করা হবে।

বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণ ও মানোন্নয়ন: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসন ও লাইব্রেরি সমস্যা দূরীকরণে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিনামূল্যে শিক্ষা সম্প্রসারণ: মেয়েদের স্নাতকোত্তর এবং ছেলেদের জন্য স্নাতক ও সমপর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

দুর্গম অঞ্চলে ঝরে পড়া রোধে উদ্যোগ গ্রহণ: পার্বত্য অঞ্চল, হাওরাঞ্চল ও চরাঞ্চলসহ দুর্গম এলাকায় অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতের বরাদ্দে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাতে একটি শিশুও শিক্ষায় আলো থেকে বঞ্চিত না হয়।

নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত কমনরুম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সংবলিত বিশেষ 'ভেন্ডিং মেশিন' স্থাপনের প্রয়াস নেয়া হবে।

শিক্ষদের অবসর ভাতা প্রাপ্তি সহজীকরণ: পেনশনের আওতাভুক্ত শিক্ষকরা যেন অবসর প্রাপ্তির পরপরই অবসর ভাতা সহজে স্ব-স্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যান সেরকম সহজ ও ডিজিটাল পেমেন্ট মডেল তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ইন্টার্নশিপ এবং ইন্ড্রাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধি: শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করতে এপ্রেন্টিসশিপ, ইন্টার্নশিপ এবং ইন্ড্রাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহরগুলোতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক স্থাপন করে এই কার্যক্রম শুরু করা হবে। ফলে শিক্ষার্থীগণ হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করবে, যা কর্মজীবনে ব্যাপক হারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সিড ফান্ডিং বা ইনোভেশন গ্রান্ট প্রদান: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনোভেটিভ বিজনেস আইডিয়া বাণিজ্যিকীকরণ করতে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় সিড ফান্ডিং বা ইনোভেশন গ্রান্ট প্রদান করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো – ক্যাম্পাস থেকে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা তৈরি করা। তাঁরা নতুন এবং সৃজনশীল ব্যবসায়িক ধারণা বাস্তবায়ন করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবেন। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট', 'সায়েন্স পার্ক' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিজ্ঞান মেলা, ইনোভেশন ফেয়ার, প্রোডাক্ট সোর্সিং ফেয়ার ইত্যাদি আয়োজনকে উৎসাহিত করা হবে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য স্টুডেন্ড লোন প্রদান ও ব্যাংক ঋণের জটিলতা দূরীকরণ: বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের সুবিধার্থে মেধাবীদের স্টুডেন্ট লোন প্রদান এবং ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তির জটিলতা দূরীকরণ করা হবে। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোনো সম্ভাবনাময় বৈদেশিক চাকরির বাজারে (জাপান, চায়না, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ইত্যাদি) ল্যাঙ্গুয়েজ বা কারিগরি শিক্ষার জন্য পড়তে যেতে চায়, তাহলে ব্যাংক ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি প্রোগ্রাম এবং এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ: বিদেশি বিশেষজ্ঞদের জন্য ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি প্রোগ্রাম চালু করে যৌথ গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মশালা আয়োজনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বহির্বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য কোনো সুবিধা নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত দীর্ঘদিনের অবহেলা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং জবাবদিহিতার ঘাটতিতে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭২ শতাংশ সরাসরি জনগণের পকেট থেকে বহন করতে হয়, ফলে অসুস্থতা এখনো দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। সরকারি হাসপাতালগুলো অতিরিক্ত চাপের মুখে, স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরুৎসাহিত ও অসমভাবে বণ্টিত, আর মানসম্মত সেবায় প্রবেশাধিকার প্রতিদিন লাখো মানুষের কাছে এক অসম লড়াই। বিএনপি বিশ্বাস করে - একটি সুস্থ দেশই উৎপাদনশীল, আত্মনির্ভর ও সার্বভৌম। 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নীতির আলোকে আমাদের লক্ষ্য হলো সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ) নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেক নাগরিককে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। চিকিৎসা খরচ মেটাতে আর সর্বস্বান্ত হওয়া নয়, মানসম্মত চিকিৎসাসেবা থাকছে সকলের দোরগোড়ায়।

স্বাস্থ্যখাতে জিডিপি'র পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ: স্বাস্থ্যখাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপি'র পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হবে। প্রতিটি মানুষ চিকিৎসা পাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী, সামর্থ্য অনুযায়ী নয়।

ই-হেলথ কার্ড: প্রত্যেক নাগরিককে একটি ইলেকট্রনিক হেলথ (ই-হেলথ) কার্ড প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে দেশের যেকোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গেলে চিকিৎসকেরা তাৎক্ষণিকভাবে রোগীর পূর্ববর্তী চিকিৎসা, পরীক্ষা ও ওষুধের তথ্য দেখতে পারবেন। ফলে, ডাক্তাররা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং সুসমন্বয়ের মাধ্যমে ভুল চিকিৎসা, ওষুধের পুনরাবৃত্তি এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বিনামূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা: প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে চিকিৎসা থাকবে সবার নাগালে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর জেনারেল প্র্যাকটিশনার (জিপি) মডেলের আদলে গ্রামের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট এবং শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এক বা একাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট ইউনিট স্থাপন করা হবে। এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধী-বান্ধব সেবা, নারী স্বাস্থ্যসেবা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের উপযোগী সেবা প্রদান করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবে একটি মিনি ল্যাব ও ফার্মেসি, যেখান থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিটের অধীনে থাকবে তিনটি প্রান্তিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (কমিউনিটি ক্লিনিক)। প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবেন তিনজন প্রশিক্ষিত কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার, যারা নিয়মিত রোগ প্রতিরোধমূলক পরামর্শ ও নানাবিধ স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন।

প্রতিটি জেলায় আধুনিক 'সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট' প্রতিষ্ঠা:

নিজ জেলাতেই জটিল রোগের পূর্ণাঙ্গ, নিরাপদ ও মানসম্মত চিকিৎসা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একটি আধুনিক সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট গড়ে তোলা হবে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শের সুযোগ, এবং ২৪ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স সেবা ও ডিজিটাল রেফারেল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হবে এবং এদেরকে মা, নবজাতক, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। জেলা হাসপাতালগুলোকে বিশেষায়িত রেফারেল কেন্দ্র করা হবে, যেখানে থাকবে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, মানসিক স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সেবা, কিডনি ডায়ালাইসিস, বড় ও ছোট সার্জারি, ট্রমা কেয়ার, আধুনিক ল্যাবরেটরি ও ইমেজিং সুবিধা এবং আইসিইউ সেবা।

১ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ: দেশজুড়ে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নতুন করে প্রায় এক লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে, যার ৮০ ভাগ হবেন নারী।

দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা: দেশের প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা হবে। বাংলাদেশে একটি জবাবদিহিমূলক ও অধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে।

রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা: গ্রামের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে শুরুতেই প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সংক্রামক রোগ, ডায়রিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও অপুষ্টি সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসমস্যা শনাক্তকরণ, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে সবার আগে নারী, শিশু ও বয়স্কদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে।

মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই নিরাপদ সন্তান প্রসবসহ পূর্ণাঙ্গ মাতৃত্বকালীন সেবা, নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ: সরকারের আর্থিক সহায়তায় উন্নতমানের বেসরকারি হাসপাতালে সড়ক দুর্ঘটনা, স্ট্রোক, হার্ট ফেইলিয়র, কিডনি ফেইলিয়র এবং ক্যান্সারের মত প্রাণঘাতি ও ব্যয়বহুল রোগের সুলভে বিশেষায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করা হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল’ দ্বারা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতালগুলো থেকে স্বাস্থ্যসেবা সরকারিভাবে ক্রয় করে দরিদ্র নাগরিকদের জটিল রোগের উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা হবে। দরিদ্র পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা, আর মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য নির্ধারিত হারে ভর্তুকি দেওয়া হবে।

ঔষধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ নেটওয়ার্ক: পর্যায়ক্রমে সারাদেশে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ঔষধ, স্বল্পমূল্যে ক্যান্সার, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস সহ প্রাণঘাতী রোগের ঔষধ এবং বিনামূল্যে দেশের তৈরি ভ্যাকসিন সরবরাহের মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য ও দামি ঔষধগুলো সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনা হবে। ঔষধের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) পুনর্গঠন করা হবে, দেশীয় এপিআই উৎপাদন ও গবেষণায় বিনিয়োগ করা হবে। সারাদেশে প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট পরিচালিত জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।

মশাবাহিত রোগ নির্মূল: ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও ম্যালেরিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধে বছরব্যাপী বিজ্ঞান-ভিত্তিক মশা নিধন এবং চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, স্যানিটেশন ও পুষ্টি সচেতনতা: স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, স্যানিটেশন এবং পুষ্টির ওপর জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য স্পেশালাইজড ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ: নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য আধুনিক পরিশোধন ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী রিজার্ভার তৈরী করা হবে।

‘জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স পুল’ ও জরুরি সেবা নেটওয়ার্ক গঠন: সময়মতো অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে আর কোনো জীবন যেন পথে না হারিয়ে যায়, তা নিশ্চিতকল্পে একটি জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স পুল/নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে, যেখানে ২৪ ঘণ্টা রোগী পরিবহন ও জরুরি সহায়তায় পাওয়া যাবে। পাশাপাশি, একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর জাতীয় জরুরি চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা ‘ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিস’ গড়ে তোলা হবে। প্রয়োজনে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি চিকিৎসা সহায়তা পেতে একটি জাতীয় ডিজিটাল কল সেন্টার বা হেল্পলাইন ও রিয়েল-টাইম রেফারেল সিস্টেম চালু করা হবে।

স্বাস্থ্যখাতে অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ‘জাতীয় ই-প্রেসক্রিপশন’ এবং ‘প্রেসক্রিপশন অডিট’ প্রবর্তন: দেশের স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল হেলথ ম্যানেজমেন্ট (হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, ওষুধ সরবরাহ, প্রকিউরমেন্ট, লজিস্টিক ও আর্থিক প্রশাসন ইত্যাদি), এআই-নির্ভর রোগ শনাক্তকরণ ও রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রেসক্রিপশন ও ওষুধ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও স্বচ্ছ করতে জাতীয় ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধের অপব্যবহার রোধে প্রেসক্রিপশন অডিট চালু করা হবে।

স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় ‘অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল’ গঠন: সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের হাসপাতাল ও ক্লিনিকের শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা আনয়ন, চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি সেবার প্রস্তুতিসহ প্রতিটি দিক নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করে স্বাস্থ্যখাতে জবাবদিহিমূলক ও পেশাদার পরিবেশে নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় হাসপাতাল ও ক্লিনিক অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হবে।

মেডিক্যাল শিক্ষায় গুরুত্বারোপ: মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করার জন্য সরকারী মেডিকেল কলেজ ও স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউটসমূহের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্যতম মূল শক্তি হলো নার্স, মিডওয়াইফ, প্যারামেডিক, মেডিক্যাল এসিস্টেন্ট, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কাররা। কিন্তু যারা মানুষের জীবন বাঁচাতে প্রতিদিন নিরলস পরিশ্রম করেন, তাদের জন্য নেই কোনো সুস্পষ্ট কর্মজীবন পরিকল্পনা। অনেকে বছরের পর বছর একই পদে থেকে যান, কেউ পদোন্নতির সুযোগ হারান, আবার অনেকেই প্রাপ্য প্রশিক্ষণ বা স্বীকৃতি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। আমরা স্বাস্থ্যখাতে চালু করব একটি সুসংগঠিত কর্মজীবন পরিকল্পনা, যাতে প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য থাকে পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, উচ্চতর শিক্ষা ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ। নার্স, মিডওয়াইফ, প্যারামেডিক, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার প্রত্যেকের জন্য থাকবে আলাদা ক্যারিয়ার কাঠামো এবং পদোন্নতি ও পদায়ন হবে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে। নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে দেওয়া হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

স্বাস্থ্যখাতে সহিংসতারোধ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: বিএনপি প্রতিটি চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য খাতে ভয়ের সংস্কৃতি শেষ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সহিংসতার প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতির ভিত্তিতে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা হবে, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা নিশ্চিন্তে রোগীদের সেবা করতে পারবেন।

মেডিকেল বর্জ্য-এর নিরাপদ ব্যবস্থাপনা: মেডিকেল বর্জ্য নিরাপদভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি, উৎসে পৃথকীকরণ, নিরাপদ পরিবহন, এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সমন্বিত ও আধুনিক পুষ্টি কর্মসূচি: বিএনপি বাংলাদেশের পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের খর্বাকৃতি মোকাবেলায় একটি সমন্বিত জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে, যা গর্ভাবস্থায় মাতৃপুষ্টি, শিশুর তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা এবং খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষা- এই তিনটি স্তরে কাজ করবে। এই কর্মসূচি কৃষি, শিক্ষা ও খাদ্য খাতের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে একীভূত থাকবে।

তামাক ব্যবহারজনিত অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহারজনিত অসংক্রামক রোগ (ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ, ফুসফুসের ব্যাধি ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে। তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে প্রয়োজনীয় আইনি উদ্যোগ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের আমলেই বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ১ম দেশ হিসেবে ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল' স্বাক্ষর করে এবং ২০০৫ সালে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রণয়ন করে, যা বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

জাতীয় সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক নিরাপত্তা বাস্তবতায় একটি আধুনিক, পেশাদার ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনি রাষ্ট্রের অপরিহার্য ভিত্তি। বিএনপি বিশ্বাস করে—সুশৃঙ্খল, রাজনীতিমুক্ত ও যুগোপযোগী সক্ষমতায় গড়ে ওঠা প্রতিরক্ষা বাহিনীই কেবল দেশকে নিরাপদ রাখতে পারে। সশস্ত্র বাহিনী যেন উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সুশৃঙ্খল ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী: সশস্ত্র বাহিনী সাহস, শৌর্য ও শৃঙ্খলায় গড়ে ওঠা জাতির এক গর্বিত প্রতিষ্ঠান। বিএনপি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে একটি আধুনিক, ক্ষিপ্র, সদা প্রস্তুত ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেবে। সশস্ত্র বাহিনীর স্বকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে একে সকল রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা হবে।

চতুর্মাত্রিক সশস্ত্রবাহিনী ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ সক্ষমতা: জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুগোপযোগী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চতুর্মাত্রিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ সক্ষমতা (ক্রেডিবল ডিটারেন্স) নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, সশস্ত্র বাহিনীর বিরাজনীতিকরণ এবং পেশাদারিত্ব জোরদার করার জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ও সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা: পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাস্তবতায় সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। বিএনপি একটি জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করবে। উক্ত কৌশলের ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির ভিত্তিতে মাল্টি-ডোমেন যুদ্ধ সক্ষমতা, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর শক্তিমত্তা এবং দেশীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যুগোপযোগী প্রতিরক্ষা নীতি ও ডকট্রিন: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের 'পিপলস ওয়ারফেয়ার ডকট্রিন'-এর আলোকে একটি আধুনিক প্রতিরক্ষা নীতি ও প্রতিরক্ষা ডকট্রিন প্রণয়ন করা হবে এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সকল নীতিমালার কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।

শক্তিশালী বিমান বাহিনী: আঞ্চলিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় শক্তিশালী বিমান বাহিনী জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। বিএনপি বিমান বাহিনীর উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকে 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ' বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে ফাস্ট ট্র্যাক প্রক্রিয়ায় কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

সমুদ্র নিরাপত্তা ও নৌবাহিনী: বাংলাদেশের সমুদ্রনির্ভর অর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎ সমুদ্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সচল রাখতে নৌ যোগাযোগপথ বা 'সি লেন অব কমিউনিকেশন' নিরাপদ রাখা নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনে বিএনপি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। আমাদের সমুদ্রসীমানা সুরক্ষিত করা হবে।

দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প: সশস্ত্র বাহিনীর চাহিদা পূরণে স্বনির্ভর 'মেইড ইন বাংলাদেশ' প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা হবে।

অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের পেনশন: অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও আর্থিক সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন (ওআরওপি)' নীতি প্রণয়ন করা হবে। পাশাপাশি, রেশনসহ অন্যান্য যৌক্তিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

গণতান্ত্রিক সামরিক–বেসামরিক সম্পর্ক: গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী সামরিক–বেসামরিক সম্পর্কের সুদৃঢ় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান: বিএনপি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শূন্য সহনশীলতা ও জাতীয় ঐকমত্য: বিএনপি সরকার বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বরদাশত করবে না এবং কোনো সন্ত্রাসবাদীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে না। জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা হবে এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব অপশক্তিকে নির্মূল করা হবে।

সামাজিক ও প্রতিরোধমূলক কৌশল: জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস দমনে দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্ব হ্রাস এবং সামাজিক বৈষম্য কমানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবিরোধী শান্তি ও সম্প্রীতির মূল্যবোধ জোরদার করা হবে এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ উৎসাহিত করে সামাজিক সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা সুদৃঢ় করা হবে।

পররাষ্ট্রনীতি

বিএনপির পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন—'সবার আগে বাংলাদেশ'। বিএনপি বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে বন্ধু আছে, কোনো প্রভু নেই। পররাষ্ট্রনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের কল্যাণ সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে। সমতা, ন্যায্যতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ একটি আত্মমর্যাদাশীল, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল বৈশ্বিক অবস্থান গ্রহণ করবে।

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক: বিএনপি সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতা, ন্যায্যতা, বাস্তবধর্মী, পারস্পরিক স্বার্থের স্বীকৃতি ভিত্তিক এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেবে। বাংলাদেশ অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না এবং অন্য কোনো রাষ্ট্রকেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না।

অর্থনৈতিক কূটনীতি: অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা ও জোট এবং উদীয়মান আঞ্চলিক জোটগুলোর সঙ্গে নতুন বাজার সুবিধা ও প্রেফারেনশিয়াল বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা হবে। বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং শিল্পে মূল্য সংযোজন বাড়াতে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। দক্ষ জনশক্তি বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ সহায়ক শ্রম ও অভিবাসন কূটনীতি জোরদার করা হবে ।

বাণিজ্য সুবিধা রক্ষা: গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করা হবে। রপ্তানি বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং শুল্ক ও বাণিজ্য সুবিধা রক্ষায় কার্যকর কূটনীতি গ্রহণ করা হবে।

রোহিঙ্গা সমস্যা: রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত সমাধান করা বিএনপি'র অগ্রাধিকার। দীর্ঘ আট বছর ধরে জনগণের ম্যান্ডেটবিহীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ হওয়ায় রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন শুরু হয়নি। বিএনপি দুইবার (১৯৭৮ এবং ১৯৯২) রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সফল হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায়, বিএনপি রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের পূর্ণ অধিকারসহ মিয়ানমারে নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রতিবেশী দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক: প্রতিবেশীদের সাথে সমতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্মিলিত অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও ন্যায্যতা সেই সম্পর্কের ভিত্তি হবে। উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

আন্তঃ সীমান্ত নদী ও জলসম্পদ: পদ্মা, তিস্তা এবং বাংলাদেশের সকল আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা হবে।

সীমান্ত নিরাপত্তা: বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে কোনো আঘাত স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় সীমান্ত হত্যা ও পুশ-ইন বন্ধসহ সকল অন্যায্য কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সীমান্তে চোরাচালান, মানব পাচার এবং মাদক পাচার কঠোরভাবে দমন করা হবে।

মুসলিম বিশ্ব: মুসলিম বিশ্বের সাথে বিএনপি'র ঐতিহাসিকভাবে গভীর সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক আরো গভীর ও শক্তিশালী করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গঠন: উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি) এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে মিলে বাংলাদেশ একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চায় যার লক্ষ্য হবে উপসাগরীয় দেশগুলোর উদ্বৃত্ত পুঁজিকে বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা ও মানবসম্পদের সাথে একত্রিত করে অর্থনৈতিক সংহতি অর্জন করা। এই অংশীদারিত্ব পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, ডিজিটাল রূপান্তর, সাইবার নিরাপত্তা এবং সামরিক শিল্প ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সহায়তা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। সম্পর্ক জোরদার করার জন্য আমরা এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথে একসাথে কাজ করব। আসিয়ানের পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন ও সার্ক কার্যকর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সার্ক ও আসিয়ান অঞ্চলের পাশাপাশি আমেরিকা, ইউরোপ, প্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশ এবং অর্থনৈতিক জোটগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব: কৃষি ও শিল্পকারখানার কাঁচামাল সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা, মেরিটাইম সিকিউরিটি, ফ্রিডম অব নেভিগেশন, উপকূলীয় নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তি বজায় রাখার জন্য আঞ্চলিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা হবে।

সফট পাওয়ার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে গুরুত্বারোপ: দীর্ঘমেয়াদে দেশের উন্নয়ন এবং 'পিপল-টু-পিপল কন্টাক্ট' বৃদ্ধির জন্য সফট পাওয়ার কূটনীতি এবং ক্রীড়া কূটনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষা-বিনিময় কর্মসূচির অধীনে শিক্ষক, গবেষক, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বেসরকারি নীতি প্রণেতা ও যুব-রাজনীতিবিদদের একটি পুল গড়ে তোলা হবে। সাংস্কৃতিক কূটনীতি প্রসারে বাংলাদেশী সংস্কৃতিমনা তরুণ প্রজন্মকে বৈশ্বিক পর্যায়ে সম্পৃক্ত করা হবে। এই সকল সক্রিয় কর্মসূচির মাধ্যমে সফট পাওয়ার বৃদ্ধি করা হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক সক্ষমতা: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ও দূতাবাসসমূহে জনবল, ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাড়তি নিয়োগ, বিদেশে মিশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রবাসীদের কল্যাণের জন্য দূতাবাস সমূহের সক্ষমতা ও তৎপরতা বৃদ্ধি করা হবে।

শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণ

বীর উত্তম শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শ্রমিকদের দুটো হাতকে উন্নয়নের চাবিকাঠি ভাবতেন। এদেশের শ্রমিকের কল্যাণে তিনি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি সরকার শ্রম আইন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ, শ্রম শিক্ষা ও কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, বেতন ও মজুরি কমিশন গঠন, গার্মেন্টস, পরিবহন, বিড়ি, লবণসহ অনেক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শসভা গঠন, বাস্তবায়ন ও

তাদের বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, লেবার কোড প্রণয়ন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সন্তানদের চিকিৎসা ও তাদের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের সামগ্রিক অগ্রগতির লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টা আগামীতেও অব্যাহত রাখা হবে।

ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণ: দ্রব্যমূল্যের ভয়াবহ উর্ধ্বগতি ও মূল্যস্ফীতির চাপে শ্রমজীবী মানুষের জীবন এখন ওষ্ঠাগত। মুদ্রাস্ফীতির আলোকে শ্রমিকদের (প্রাইস-ইনডেক্স বেইজড) ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হবে। বাজারমূল্য ও মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সকল সেক্টরে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য প্রতি দুই বছর অন্তর রিভিউ ব্যবস্থা চালু করা হবে। চা-বাগান, বস্তি, চরাঞ্চল, হাওড়-বাওড় ও মঙ্গাপীড়িত ও উপকূলীয় অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণের আয়-উপার্জনে বৈষম্য দূরীকরণ ও সুষম উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের যৌক্তিক মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত শ্রমজীবী যেমন: রিক্সাচালক, হকার, ঘাট শ্রমিক, দিনমজুর, ফুটপাত ও ভাসমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিরাপত্তাকর্মী, গৃহকর্মী, ইটভাটার শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক ও পরিবহন শ্রমিকসহ প্রাইভেট সেক্টরের কর্মীদের যৌক্তিক মজুরি নির্ধারণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চুক্তিভিত্তিক, দৈনিকভিত্তিক,ঔষধ বিক্রয় প্রতিনিধি, মুদি পণ্য ইত্যাদির বিক্রয় প্রতিনিধি, নির্মাণ শ্রমিক, হকার, রিকশা/অটোরিকশা চালক, স্বনিয়োজিত শ্রমিক প্রভৃতি শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে আলাদা শ্রম সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে। শিক্ষানবিশ শ্রমিক নিয়োগের আইনি বিধান কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেনশন ব্যবস্থা চালুকরণ: রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। জাতীয় বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে এই পেনশন পরিচালিত হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার: বিএনপি শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি করার গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করবে।

বন্ধশিল্প চালুকরণ: পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকলসহ সকল বন্ধ শিল্প পুনরায় চালুর কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে 'টাস্কফোর্স' গঠন করে দ্রুত সরকারী, সরকারী-বেসরকারী যৌথ মালিকানায় কিংবা ব্যক্তিমালিকানায় বন্ধ শিল্পগুলো চালু করা হবে। দেশীয় কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

শ্রমিকদের ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত: কারখানা ও শিল্পঘন এলাকায় টিসিবির মাধ্যমে স্থায়ী ন্যায্যমূল্যের দোকান এবং 'ওএমএস'-এর মাধ্যমে সহজে ও সাশ্রয়ী মূল্যে শ্রমিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য প্রাপ্তি সুযোগ তৈরি করা হবে।

একই কাজে সমান মজুরি বাস্তবায়ন: সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে মজুরি বৈষম্য কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রমিকের জন্য একই কাজে সমান মজুরি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হবে।

সবেতন ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি: মালিকানা নির্বিশেষে সকল নারী শ্রমিক-কর্মচারীর সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস নির্ধারণ করা হবে।

ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ: শ্রমিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের আইনগত অধিকার রক্ষায় দ্রুত ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শ্রমিক স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিত করতে জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় খাতের দায়িত্ব সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা হবে। শ্রমঘন এলাকায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হবে যেখানে শ্রমিকরা তাদের সুবিধা ও সময় অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে পারবেন। শ্রমিকদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য সকল শিল্পাঞ্চলে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন/ সম্প্রসারণ করা হবে।

দুর্ঘটনারোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ: শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, বয়লার অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

শিশু শ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধকরণ: শিশু শ্রম বন্ধ করে তাদের জীবন বিকাশের উপযোগী পরিবেশ ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শ্রম খাতসমূহে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথা থেকে মুক্ত করতে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে কার্যকর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের শ্রমিকদের উন্নয়ন: ট্যানারি, ফুটওয়্যার, কৃষিভিত্তিক, ফুল, ফল এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি, দেশের সকল সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহ পরিকল্পিতভাবে আধুনিকায়ন ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সকল প্রকার সরকারি প্রণোদনা/ কর রেয়াতের সাথে কর্মসংস্থানকে সম্পর্কিত করা হবে।

কর্মজীবী নারীদের সুরক্ষা: কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিক ও কর্মজীবীদের যৌন হয়রানি ও কোন প্রকার সহিংসতাকে কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না। নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ আবাসন ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে।

সম্পর্ক উন্নয়ন: মালিক – শ্রমিকদের সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শান্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্ধিত উৎপাদনশীলতার ফলে অর্জিত মুনাফার ন্যায্য অংশ যেন শ্রমিকেরাও পায় তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা: অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উদ্ভূত সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ: চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে নিহত শ্রমিকদের যথাযথ স্বীকৃতি ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে এবং

আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। একইসাথে, রানা প্লাজা, তাজরিন ফ্যাশন এবং হাসেম ফুডসহ উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনাসমূহের জন্য দায়ীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশে প্রথম জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে সিন্ডিকেট করে গুটিকয়েক এজেন্সি জনশক্তি রপ্তানি ব্যাবসাকে কুক্ষিগত করে রাখে। সিন্ডিকেট এর কারণে একদিকে যেমন জনশক্তি রপ্তানি ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষ প্রতারিত হয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিগত সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে বৈধ উপায়ে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যর্থ হয়। এমনকি অনেক রাষ্ট্রে বৈধভাবে জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। বিএনপি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে বিরাজমান সিন্ডিকেট ও প্রতারনা বন্ধে এবং জনশক্তি রপ্তানির সকল বাঁধা দূর করার উদ্যোগ নেবে। প্রবাসী কর্মীদের জীবন, মর্যাদা ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর এবং দূতাবাসের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বিবেচিত হবে। প্রবাসীদের কল্যাণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তিকে তৈরি করতে অবকাঠামোগত ও গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হবে। অভিবাসন ব্যয় যুক্তিসংগতকরণ, এয়ারপোর্টগুলোতে দ্রুত ট্রলি সংকট নিরসণ, খাবারের মান উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রবাসী ভাইবোনদের লাগেজ ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কঠোর নজরদারি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রাবাসীদের মানবাধিকারসহ সব অধিকার আদায়ে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রবাসী নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও মানবপাচার রোধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিদেশে কর্মসংস্থান বিস্তৃতি: পাঁচ বছরে এক কোটি জনশক্তি বিদেশে প্রেরণ করা হবে। উপজেলায় তালিকাভুক্তদের প্রশিক্ষণ, ভাতা প্রদান ও দরিদ্রদের শূন্য/ ন্যূনতম খরচে প্রবাসে প্রেরণ করা হবে। ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে। বিমানবন্দর ও দূতাবাসে ঝামেলামুক্ত সম্মানজনক সেবা নিশ্চিত করা হবে।

প্রবাসী কার্ড: প্রবাসীদের ‘প্রবাসী কার্ড’ দেয়া হবে, যাতে তথ্য, দক্ষতা ও চাকরির শর্ত সংরক্ষণ থাকবে। ব্যাংক পেমেন্ট গেটওয়েতে যুক্ত থাকবে, থাকবে সহজ রেমিটেন্স প্রেরণের সুবিধা। রেমিটেন্সে বাড়তি প্রণোদনা পাওয়া যাবে এবং দেশে ফেরত প্রবাসীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ফাউন্ডেশন: প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রবাসী কল্যাণ ফাউণ্ডেশনের সদস্যপদ দেয়া হবে। মৃত্যু/দুর্ঘটনা/চাকরি হারালে সহায়তা দেয়া হবে। উদ্যোক্তা সহায়তায় এসএমই/ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রাপ্তির সুযোগ থাকবে। দেশে ফেরত প্রবাসীদের কর্মসংস্থান ও পরিবারের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেয়া হবে। পুনরায় বিদেশযাত্রায় সহায়তা দেয়া হবে।

ওভারসিজ স্কিলস ইনভেস্টমেন্ট পার্ক ও প্রবাসীদের বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান: ১০০ একর জমিতে একটি বিশেষায়িত জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা স্বল্প ভাড়ায় বা লিজ নিয়ে আধুনিক মানের স্কিলস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করতে পারবেন। পাশাপাশি, প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহ, সুযোগ এবং বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে গতিশীল ও সেবামুখী করা হবে। বিদেশে বিশেষ ‘ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট মেলা’ আয়োজনের মাধ্যমে বিনিয়োগনীতি, প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে।

শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ: পলিটেকনিক, টিটিসি ও বিটিইবি-সহ সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৭৫০০ দেশি এবং উন্নত বিশ্ব থেকে ১০০০ দক্ষ বিদেশি প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

ভাষাগত দক্ষতা: আরবি, ইংরেজি, জাপানিজ, জার্মান ও কোরিয়ান ভাষার জন্য ১০০০ প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। ১০০ জন নেটিভ স্পিকার সরাসরি স্থানীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

অবকাঠামো ও প্রযুক্তি সংস্কার: আগামী অর্থ বছরেই, পলিটেকনিক, টিটিসি, বিটিইবি ও অন্যান্য সরকারী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুরাতন যন্ত্রপাতি আপগ্রেড এবং নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ৪০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ই-লার্নিং সেন্টার: বিএমইটিতে একটি 'ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ই-লার্নিং সেন্টার' স্থাপন করা হবে। এই সেন্টার থেকে অনলাইনে আরবি, ইংরেজি, জাপানিজ, জার্মান ও কোরিয়ানসহ বিভিন্ন ভাষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেন্টার হতে হাইব্রিড পদ্ধতি মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জাতীয় কারিগরি দক্ষতা কমিশন: সকল কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষনের মান নিয়ন্ত্রন, অর্থায়ন এবং কারিকুলাম সমন্বয়ের জন্য 'প্ল্যানিং কমিশন'-এর আদলে একটি শক্তিশালী 'জাতীয় কারিগরি দক্ষতা কমিশন' গঠন করা হবে। এই কমিশন কোর্সের মানদণ্ড নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে। বিশ্ববাজারের দেশভিত্তিক চাহিদা বিশ্লেষণ করে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, যাতে বর্তমানের তুলনায় সহজে এবং অধিক সংখ্যক উচ্চ বেতনের চাকুরির সংস্থান হয়।

দক্ষ কর্মীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ ও আরপিএল: বিদেশি নিয়োগকর্তাদের আস্থা অর্জনে একটি শক্তিশালী 'স্কিল ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম' চালু করা হবে। এর মাধ্যমে প্রতিটি কর্মীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সার্টিফিকেট যাচাই করে একটি 'স্মার্ট স্কিল ব্যাংক' বা ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। যাচাইকৃত কর্মীদের প্রদান করা হবে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ডিজিটাল সার্টিফিকেট, যাতে বিদেশী নিয়োগকর্তারা সরাসরি মান নিয়ন্ত্রিত দক্ষ লোককে চাকুরি দিতে পারেন।

মাইগ্রেশান মার্কেট রিসার্চ ইনস্টিটিউট গঠন: প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি 'মাইগ্রেশন মার্কেট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' গঠন করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা নিয়মিত গবেষণা করবে এবং সেই অনুযায়ী দেশের কারিগরি প্রশিক্ষণের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার ও কারিকুলাম তৈরি করবে।

ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অধীনে ‘ওয়ান-স্টপ প্রবাসী সাপোর্ট সেন্টার’: প্রবাসীদের আইনি সুরক্ষা ও দাপ্তরিক সেবা নিশ্চিত করতে ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়ান-স্টপ সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সেন্ট্রাল ডিজিটাল মনিটরিং: একটি কেন্দ্রীয় ই-প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

বিদেশস্থ দূতাবাস, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের মধ্যে সমন্বয় করা হবে। এর ফলে প্রবাসীদের প্রতিটি অভিযোগের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে নিবিড় ডিজিটাল ফলো-আপ নিশ্চিত করা হবে।

দূতাবাসে দ্রুত সেবা প্রদান: দূতাবাসগুলো যাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ করে প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা হবে। সব দূতাবাসে জনবল যুক্তিসংগত হারে বৃদ্ধি করে সেবা সহজলভ্য করা হবে।

বাংলাদেশ সাপোর্ট সেন্টার ও লিগ্যাল ডিভিশন চালুকরণ: বিদেশের প্রধান দূতাবাসগুলোতে পিপিপি মডেলে স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থার সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ সাপোর্ট সেন্টার' হবে। এটি জেলে থাকা, নিগৃহীত বা প্রতারিত কর্মীদের উদ্ধার, নতুন চাকরি ও, বিদেশে নিয়োগকর্তার সাথে বিরোধ ও বিবিধ আইনি সহায়তা দেবে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আলাদা 'লিগাল ডিভিশন' এবং তার অধীনে প্রধান হাই-কমিশনগুলোতে 'লিগাল উইং' তৈরি করা হবে ।

কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ও ঝুঁকিমুক্ত অভিবাসন নিশ্চিতকরণ: বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, ঝুঁকিমুক্ত অভিবাসন নিশ্চিতকরণ ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রতারণা ও ভোগান্তি নিরসনকল্পে ভোক্তাদের সঠিক চুক্তিপত্র ও মানিরিসিপ্ট এর মাধ্যমে লেনদেন বাধ্যতামূলক করা হবে। দক্ষ শ্রমিকদের সঠিক এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য রেমিট্যান্স প্রেরণ: প্রবাসীরা যাতে তাদের কষ্টার্জিত আয় বৈধ পথে সহজে বাংলাদেশে প্রেরণ করতে পারে সে জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক এক্সচেঞ্জ হাউস/ব্যাংকের সংগে প্রণোদনা সুবিধাসহ দ্রুত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য রেমিট্যান্স প্রেরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

প্রবাস ফেরত শ্রমজীবীদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ: চাকুরির উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশীদের পরিসংখ্যান থাকলেও, চাকুরি শেষে বিদেশ থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশীদের কোনো পরিসংখ্যান নাই। বিদেশ থেকে ফেরত আসা প্রবাসীদের যথাযথ তালিকা প্রস্তুত করে তাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে নানামুখী প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

প্রবাসী সিটি গড়ে তোলা: প্রবাসীদের জন্য মানসম্পন্ন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন আবাসন প্রকল্প হিসেবে 'প্রবাসী সিটি বা ওয়েজ আর্নার্স গ্রীন সিটি' গড়ে তোলা হবে। এই আবাসন সিটিতে তারা স্বল্পদামে বাড়ি/ প্লট ক্রয় করতে পারবেন। এখানে আধুনিক হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পার্ক, খেলার মাঠসহ সকল জরুরি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

মৃত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের লাশ দেশে প্রত্যাবর্তন সহজীকরণ: প্রবাসে বাংলাদেশের যে সকল রেমিট্যান্স যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের মৃতদেহ সম্মানের সাথে দেশে প্রত্যাবর্তনের পদ্ধতি ও পথ সহজতর করা হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ, সক্ষম ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে চাই। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সীমাবদ্ধতা জয় করে নিজের স্বপ্নপূরণের সুযোগ পাবেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের মানোন্নয়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যার ভিত্তি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, সামাজিক সক্ষমতা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপন: প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপনের চেষ্টা করবো, যেখানে শারীরিক থেরাপি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার আধুনিক সুবিধা থাকবে।

বিশেষায়িত স্কুল প্রতিষ্ঠা: জেলা পর্যায়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থাকবে, যেখানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, ব্রেইলসহ ইনক্লুসিভ এডুকেশনের আধুনিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কারিগরি শিক্ষায় স্কলারশিপ প্রদান: কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ তৈরি এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

মোবাইল হেলথ ক্লিনিক: প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগণের জন্য মোবাইল হেলথ ক্লিনিক চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সহায়ক উপকরণ তৈরিতে প্রণোদনা প্রদান: বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ তৈরির জন্য কারখানা স্থাপনে প্রণোদনা এবং আমদানির ক্ষেত্রে কর মওকুফের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। গুরুতর প্রতিবন্ধীদের জন্য নিবিড় পরিচর্যার বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে।

নিয়োগ প্রদানে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা: দেশের বড় ব্যবসাগুলো একটি নির্দিষ্ট শতাংশ শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জড ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ট্যাক্স সুবিধা বা কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা: একটি স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করবে।

প্রশিক্ষণ ও প্যারা অলিম্পিকের সহায়তা সম্প্রসারণ: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট, প্রান্তিক থেকে কেন্দ্রীয় পর্যন্ত খেলাধুলার সিস্টেমেটিক ডেভেলপমেন্ট এবং টুর্নামেন্টের মাধ্যমে প্যারা অলিম্পিকের সহায়তা করা হবে।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইনগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন: প্রতিবন্ধী বিষয়ক বর্তমান আইন ও প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫-কে হালনাগাদ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিবন্ধীবান্ধব নাগরিক সেবা গঠন: বাস, ট্রেন, সড়ক পথ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তাদের চলাচল উপযোগী কাঠামো নির্মাণে উদ্যোগ নেয়া হবে। হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

সাংগঠনিক ও সৃজনশীল কাজে সহায়তা: দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোর প্রতিবন্ধী বিষয়ক গবেষণা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সামাজিক ব্যাধির সমস্যা

মাদক দমন এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন: মাদকের মরণ ছোবল থেকে কিশোর ও যুব সমাজকে মুক্ত করার জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করা হবে। মাদক ও তামাক আমদানি, উৎপাদন, বিপনন এবং বাংলাদেশে এসবের বেআইনি প্রবেশ রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য মানসিক চিকিৎসা সহায়তা, মানসম্মত কাউন্সেলিং এবং উপযুক্ত সামাজিক সহায়তার প্রসার ঘটানো হবে।

মানসিক চিকিৎসার খাতের উন্নয়ন ও সেবা সম্প্রসারণ: মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হবে। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিষ্ট, মনোবৈকল্য বিশেষজ্ঞ এবং সাইকোথেরাপিষ্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোকে মনোবৈকল্য চিকিৎসক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন

২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি: আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি গাছ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। বৃক্ষরোপণকে শুধু গতানুগতিক কর্মসূচির মধ্যে না রেখে, বরং জনগণের অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রজন্মগত উন্নয়নের এক সবুজ বিপ্লবে রূপান্তর করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ৩.৫ লক্ষাধিক সবুজ কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যেখানে নারী, যুবক-যুবতী ও গ্রামীণ জনগণ সমানভাবে অংশ নেবে। একই সঙ্গে ১০,০০০ নতুন নার্সারি উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হবে, যা ২.৫ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক বৃক্ষরোপণ: বৃক্ষরোপণকে বিজ্ঞানসম্মত ও টেকসই করতে চালু করা হবে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত 'জমি তালিকা মানচিত্র',যা উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করবে ও অঞ্চলভেদে বৃক্ষের প্রজাতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে 'ট্রি মনিটরিং অ্যাপ': প্রতিটি গাছের রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণের জন্য চালু হবে একটি 'ট্রি মনিটরিং অ্যাপ', যা চারাগাছ থেকে পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত ডিজিটাল নজরদারি নিশ্চিত করবে।

দ্বীপ ও চরাঞ্চলে সবুজায়ন: নদী, খাল, চর ও মেঘনা মোহনায় নবগঠিত দ্বীপে দ্রুত বৃক্ষরোপণের জন্য ব্যবহৃত হবে বিশেষায়িত ড্রোন প্রযুক্তি, যা দেশব্যাপী সবুজায়নকে তরান্বিত করবে।

ভবন নির্মাণে 'সবুজ পরিমাপক' মানদণ্ড ও 'গ্রীণ বিল্ডিং সার্টিফিকেশন' প্রচলন: নগর এলাকায় পার্ক এবং ফুটপাত ও খেলার মাঠের পাশে উপযোগী গাছ লাগানো হবে, এবং ভবন নির্মাণ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বাধ্যতামূলক 'সবুজ পরিমাপক' মানদণ্ড। বড় শহরে 'গ্রীণ বিল্ডিং সার্টিফিকেশন' ব্যবস্থা ও কর-প্রণোদনার মাধ্যমে ছাদ-বাগানসহ বনায়ন উৎসাহিত করা হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন: ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের অন্তত ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস, যেমন সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ ও বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে গড়ে তোলা হবে সবুজ শক্তিনির্ভর অর্থনীতি।

ধান চাষে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার: ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের ৩০–৫০ শতাংশ ধানীজমিতে পানি সাশ্রয়ী 'অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইয়িং (এডব্লিউডি)' প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হবে। এর ফলে একইসঙ্গে ধানে সেচের পানির ব্যবহার এবং মিথেন গ্যাস নির্গমন প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে, এবং ধানচাষ থেকে কৃষকের মুনাফা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে।

সবুজ 'স্বেচ্ছাসেবা', 'ক্লাইমেট ইয়ুথ ফেলোশিপ' এবং 'পরিবেশ স্টার্টআপ তহবিল' গঠন: শিক্ষার্থীদের পরিবেশ-সচেতন করতে স্কুল পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হবে 'সবুজ স্বেচ্ছাসেবা'। 'ক্লাইমেট ইয়ুথ ফেলোশিপ' চালু এবং 'পরিবেশ স্টার্টআপ তহবিল' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কার্বন ক্রেডিট আয়: বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে বাংলাদেশে বছরে এক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত কার্বন ক্রেডিট আয় করার সম্ভাবনা রয়েছে। বিএনপি এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবে।

কার্বন ট্রেডিং মার্কেট গঠন: কার্বন নিঃসরণের প্রধান তিনটি খাত (জ্বালানি, কৃষি, ও বর্জ্য) থেকে, এবং সেই সাথে পুনঃবনায়নের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করা হবে মেজারমেন্ট, রিপোর্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন (এমআরভি) সিস্টেম, যার দ্বারা বিএনপি দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্বন ট্রেডিং মার্কেট গঠন করবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'সার্কুলার ফিউচার মডেল' বাস্তবায়ন: বিএনপি'র লক্ষ্য হলো একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্জীবিত বাংলাদেশ, যেখানে বর্জ্যই নতুন সম্পদ, এবং পরিবেশই উন্নয়নের শক্তি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বিএনপি একটি 'সার্কুলার ফিউচার মডেল' প্রতিষ্ঠিত করবে, যেখানে বর্জ্যকে রূপান্তর করা হবে সম্পদে।

অঞ্চলভিত্তিক 'মেটেরিয়াল রিকভারি সেন্টার' স্থাপন ও দুই লাখ কর্মসংস্থান: বর্জ্য উৎপাদনের পরিমান অনুযায়ী নির্দিষ্ট জেলা এবং অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবে মেটেরিয়াল রিকভারি সেন্টার। সেই সাথে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রতিটি বিভাগে স্থাপিত হবে ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার কারখানা, যেখান থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুই লাখ ভ্রাম্যমান পেশাজীবীদের আনুষ্ঠানিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'থ্রি আর' নীতির বাস্তবায়ন: দেশব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হবে 'থ্রি আর' নীতি – রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল, যার মাধ্যমে পাঁচ বছরের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ৩০ শতাংশ কমানো হবে।

বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন: বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন প্রকল্প চালু করা হবে, যা শহরগুলোর জ্বালানি চাহিদা মেটাবে ও দূষণ কমাবে। পাশাপাশি, বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন এবং প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনঃব্যবহারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

শিল্প ও গৃহস্থালিতে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার উৎসাহিতকরণ: ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও বিষাক্ত রাসায়নিক ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ করে শিল্প ও গৃহস্থালিতে পরিবেশবান্ধব বিকল্প উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। ঢাকা শহরকে দূষণের কবল থেকে রক্ষা করতে দ্রুত যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দেশের শহরগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থাপনা দূর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ

বনাঞ্চল, জলাভূমি ও চারণভূমি সংরক্ষণ: দেশের বনাঞ্চলগুলোকে পুনর্জীবিত করার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

শুকিয়ে যাওয়া নদী-খাল, হাওড় ও বিল অঞ্চল, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, প্রাকৃতিক নিম্নভূমি ইত্যাদি জলাধার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। চর এলাকাগুলোকে বেআইনি দখলমুক্ত করে গবাদি পশুর চারণভূমিতে পরিণত করে পুষ্টিমানসম্পন্ন দুধ ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হবে।

বনজ সম্পদ ও পাহাড় নিধনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণ: বন উজার, বন দখল, বনের সম্পদ চুরি, পাহাড় কাটা, ম্যানগ্রোভ বনের ক্ষতিসাধন, বন্য প্রাণী নিধন ইত্যাদি কার্যক্রমকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। এই ধরনের কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল ও অভয়ারণ্য সংরক্ষণ: বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল ও অভয়ারণ্য এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপন নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বারবার সড়ক খোড়াখুড়ি বন্ধকরণ: বারবার রাস্তা খোড়াখুড়ি এবং রোড ডিভাইডার ভাঙ্গার ফলে যে জনদুর্ভোগ ও সম্পদের ক্ষতি হয়, সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিএনপি সুদূরপ্রসারী ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

বেদখলকৃত নৈসর্গিক স্থান উদ্ধার: বাংলাদেশে নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডি অনেক স্থান রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এ স্থানগুলো বেআইনি দখলের শিকার হয়েছে। এসকল স্থানকে চিহ্নিত ও উদ্ধার করে পর্যটকদের প্রকৃতি উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা হবে।

খাল ও নদী পাড়ের পরিকল্পিত ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন: উপযুক্ত টেকসই প্রকল্পের আওতায় নদীপাড়ে ও খালের তীরে চালু করা হবে 'গ্রীন ক্যানেল ব্যাংক মডেল' – যেখানে বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে এক নতুন সবুজ অর্থনীতি।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ওয়াটার কনভেনশন-১৯৯৭ স্বাক্ষর: জাতিসংঘের ওয়াটার কনভেনশন-১৯৯৭ (কনভেনশন অন দ্য ল' অফ দ্য নন-ন্যাভিগেশনাল ইউজেস অফ ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্সেস) স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশের পানির সমস্যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরা হবে।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা ও পদ্মা ব্যারেজ বাস্তবায়ন: তিস্তা এবং পদ্মা ব্যারেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে পানি নিরাপত্তা, বন্যা ও মরুকরণ প্রতিরোধ নিশ্চিত করা হবে। এই উদ্যোগে ৭৫ লাখ হেক্টর জমি সেচ সুবিধা পাবে এবং ৫ কোটিরও বেশি মানুষ বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে।

কৃষিজমিতে লবণাক্ততা হ্রাসকরণ: দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলোতে পানি প্রবাহ বাড়িয়ে সুন্দরবন সংলগ্ন কৃষিজমিতে লবণাক্ততা হ্রাস করার চেষ্টা করা হবে।

যৌথ নদী কমিশনকে শক্তিশালীকরণ: যৌথ নদী কমিশনকে শক্তিশালী করে সীমান্তের ওপাড় থেকে প্রাবাহিত নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই ব্যাপারে নেপাল, ভুটান ও চীনকেও অংশীদার করা হবে। এছাড়াও সব পানি চুক্তি নতুন ভাবে পর্যালোচনা করা হবে যাতে কোন দেশই এক তরফা সুবিধা না পায়।

পানি সংরক্ষণ: উপকূলীয় জেলাগুলোতে গ্রামীণ প্রাকৃতিক জলাধার গড়ে তোলা হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে পানীয় জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। ঢাকায় ও বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে সুউচ্চ দালান এবং রিয়েল এস্টেট কোম্পানির জন্য বাসা-বাড়িতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা ও গ্রে-ওয়াটার পুনঃব্যবহার নিশ্চিতে প্রয়াস নেয়া হবে।

বন্যায় সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ: বন্যা কবলিত এলাকাতে উচু রাস্তা, আশ্রয়কেন্দ্র, কালভার্ট এবং আধুনিক সতর্ককীরন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেকসই ও কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট ও ক্ষতি মোকাবিলায় টেকসই ও কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বাধুনিক ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তুলতে বিশ্বজনমত গঠন ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

জাতীয় সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ইউনিট গঠন: প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে দ্রুত সাড়া জাতীয় সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এই ইউনিটে ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও স্থানীয় সেবাদানকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন একত্রে কাজ করবে একীভূত কমান্ড কাঠামোয়। প্রতিটা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় একটা কমান্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং সেখান থেকে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা পরিচালিত হবে।

'ফায়ার-রেসকিউ সেন্টার' চালু: প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক যন্ত্রপাতি, ড্রোন, প্যারামেডিক ও এম্বুলেন্সসহ ২৪ ঘণ্টা কার্যকর 'ফায়ার-রেসকিউ সেন্টার' চালু করা হবে। ৫০,০০০ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত থাকবে জরুরি মুহূর্তের জন্য। প্রতিটি বিভাগে রেসকিউ হেলিকপ্টার ও এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নিশ্চিত করা হবে, যা দুর্গম এলাকা থেকেও দ্রুত উদ্ধার নিশ্চিত করবে।

বিল্ডিং ফায়ার সেফটি কোড বাস্তবায়ন: বিল্ডিং ফায়ার সেফটি কোড-২০২৬ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত জবাবদিহিমূলক তদারকি কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

ভূমিকম্প: ভূমিকম্পজনিত-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি সর্বাত্মক ও পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিদ্যমান সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হবে। ভূমিকম্পে আত্মরক্ষার করণীয় বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। ভূমিকম্প-উত্তর পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে।

নদীভাঙ্গন রোধ: নদীভাঙ্গন রোধ এবং নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার

অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ণ–ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি

অর্থনৈতির গণতন্ত্রায়ণ: বিএনপি'র নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এই যাত্রা কোনো গোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের উৎপাদনশীল শক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হবে। এই ভিশনের কেন্দ্রে রয়েছে অর্থনৈতির গণতন্ত্রায়ণ (ইকনোমিক ডেমোক্রাটাইজেশন) – যেখানে অর্থনীতি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং সবার জন্য উন্মুক্ত।

অর্থনীতিতে অলিগার্কিক কাঠামো ভেঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ: সম্পদ ও সুযোগকে একচেটিয়া করে রাখা অলিগার্কিক কাঠামো ভেঙে এমন একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের প্রকৃত অংশীদারত্ব থাকবে। ন্যায্য মূল্যবন্টন, অর্থায়ন ও বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হবে এই এজেন্ডার মূল প্রতিশ্রুতি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সর্বাধিক প্রাধান্য: বিএনপি'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। ঋণ-নির্ভর অর্থনীতিকে বিনিয়োগ-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সম্পদ তৈরিতে বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতি হবে চালিকাশক্তি।

ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গঠন: আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করা, যেখানে ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে।

রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সমন্বয় সাধন: দেশে রাজস্ব ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় কৌশলের মাধ্যমে একটি গতিশীল ও সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ গঠন: দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস এবং ইজ অব ডুয়িং বিজনেস এর উন্নয়নে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অর্থনীতিতে বিনিয়ন্ত্রিকরণ নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে একটি কার্যকর ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়ন: ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়রানি ও জটিলতা নিরসনকল্পে সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স, ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল কর্মপ্রবাহ তৈরি করা হবে। একই সাথে, সরাসরি শারীরিক যোগাযোগের পরিমাণ হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিনিয়োগ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

বিগত সময়গুলোতে বিএনপি সরকার মুক্তবাজারমুখী নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনের শাসন, ও নিয়মভিত্তিক ব্যবসায়িক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজি প্রবাহের মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার মাধ্যমে দেশীয় ও বৈশ্বিকভাবে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে। এমন এক ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে, যেখানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজি যৌথভাবে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা ত্বরান্বিত করতে কাজ করবে। বাংলাদেশকে এক নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বিনিয়োগ জিডিপি'র ২.৫ শতাংশে উন্নীতকরণ: এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক রোডম্যাপ অনুযায়ী বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ জিডিপির ০.৪৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে উন্নীত করার চেষ্টা করা হবে।

নীতির আকস্মিক পরিবর্তন রোধ: আমরা আমাদের কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন অংশীদারদের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নীতির আকস্মিক পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। বিএনপি এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে, শুল্ক, কর, ও রপ্তানি প্রণোদনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে। বৈদেশিক মুদ্রা নীতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হবে।

বিডা-তে 'সিঙ্গেল উইন্ডো' বাস্তবায়ন: বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর অধীনে একটি 'সিঙ্গেল উইন্ডো' চালু করা হবে, যেখানে সব অনুমোদন ও নিবন্ধন এক জায়গায় প্রদান করা হবে। কোম্পানি নিবন্ধন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এবং ওয়ার্ক পারমিট সাত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

'এফডিআই ক্যাপ্টেন' নিয়োগ ও ২৪/৭ ঘণ্টা সচল হেল্পডেস্ক: যোগাযোগকারী হিসেবে কাজ করবেন। বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরিতে ২৪/৭ (ঘণ্টা/দিন) সচল হেল্পডেস্ক ও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট সহজীকরণ: বিনিয়োগকারী ও প্রয়োজনীয় কর্মকর্তাদের ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট ১০ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। পাঁচ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ইনভেস্টর ভিসা চালু করা হবে।

হয়রানিমুক্ত ও দ্রুত মুনাফার প্রত্যাবসান নিশ্চিতকরণ: বৈধভাবে পরিচালিত বিদেশি ব্যবসাগুলো যাতে ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত মুনাফা নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে পারে সে সংক্রান্ত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি ও দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির সংখ্যা বাড়ানো হবে।

ভ্যাট ও কাস্টমস রিফান্ড ডিজিটালাইজ করা: ভ্যাট ও কাস্টমস রিফান্ড ডিজিটালাইজ করা হবে।

অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটালকরণ: বিনিয়োগকারীরা যাতে প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু করতে পারে সেলক্ষ্যে 'প্লাগ অ্যান্ড পে' পরিবেশ তৈরি করতে অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা হবে। বিনিয়োগকারীদের সাথে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্যাদি সহজীকরণ করা হবে।

যৌথ অংশীদারিত্বে কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন: বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে, যাতে প্রকৌশল, আইটি এবং

আধুনিক উৎপাদন খাতে দক্ষতা তৈরি হয়।

বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় 'ইনভেস্টর প্রোটেকশন রেগুলেশন' প্রণয়ন: বিনিয়োগকারীদের ট্যাক্সের স্থিতিশীলতা, অধিকার সুরক্ষা এবং নীতিগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে 'ইনভেস্টর প্রোটেকশন রেগুলেশন' প্রণয়ন করা হবে।

বাণিজ্যিক মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আদালত' প্রতিষ্ঠা: বাণিজ্যিক মামলা নির্দিষ্ট সময়সীমায় নিষ্পত্তি করতে 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আদালত' প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং আন্তর্জাতিক সালিশি বিকল্প উত্সাহিত করা হবে ।

শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ: অবকাঠামো বিনিয়োগের ভিত্তি। তাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, আধুনিক সড়ক, বন্দর ও লজিস্টিক হাব উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে এবং বাড়ানো হবে।

'নেক্সট ফ্রন্টিয়ার ইকোনমি' ব্রান্ডিংয়ে বৈশ্বিক প্রচারণা: বাংলাদেশকে 'নেক্সট ফ্রন্টিয়ার ইকোনমি' হিসেবে ব্র্যান্ডিং করার জন্য বৈশ্বিক প্রচারণা চালানো হবে। দূতাবাস ও রোডশোর মাধ্যমে দেশের সম্ভাবনাময় খাতগুলো তুলে ধরা হবে।

অযৌক্তিক কর সংস্কার ও আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম সহজীকরণ: করভীতি দূর করে করজাল সম্প্রসারণ করা হবে। বাণিজ্যের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনর্বিনিয়োগ প্রণোদনা ও আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম সহজীকরণ করা হবে।

অগ্রাধিকার খাত: কৃষি-প্রক্রিয়াজাত শিল্প, আইটি ও ডিজিটাল সার্ভিস, ঔষধউৎপাদন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়া-জাত পণ্য, সৃজনশীল খাত (চলচ্চিত্র, সংগীত, শিল্প, ডিজাইন) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি হবে অগ্রাধিকার খাত। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এলক্ষ্যে, কর, ভ্যাট ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক করনীতি পুনর্বিবেচনা করা হবে।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানির বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। বিএনপি'র উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, নীতি ও কাঠামোগত বাধা দূর করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হবে।

সার্বিক নীতিগত সুবিধা প্রদান: বেসরকারি খাত উন্নয়নে সার্বিক নীতিগত সুবিধা প্রদান করা হবে। ব্যবসা নিবন্ধন, লাইসেন্স, ট্যাক্স সার্টিফিকেট (টিআইএন), আইনি-নিয়ন্ত্রণ – সব ক্ষেত্রেই জটিলতা কমিয়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা হবে।

লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজীকরণ: লাইসেন্স নবায়নে জটিলতা কমাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বহুবিধ অনুমতির সংখ্যা কমিয়ে 'কমন এপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম' চালু করা হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্টার্টআপের জন্য গ্যারান্টি স্কিম, ক্যাশ-ফ্লো ভিত্তিক ঋণ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ক্রাউডফান্ডিং এবং ইনস্যুরেন্স কভারেজ বৃদ্ধি করা হবে। এই খাতে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য বিশেষ ব্যাংকিং সেবার আওতা সম্প্রসারিত করা হবে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিল্পপার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ: পরিবহন, লজিস্টিক্স, বিদ্যুৎ – এ সকল ক্ষেত্রে মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর উন্নয়ন এবং নতুন শিল্পপার্ক দ্রুত বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হবে। বিদ্যমান শিল্পপার্কগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যুব সম্প্রদায়ের স্টার্ট-আপগুলোর ছোট ছোট শিল্প ইউনিটকে সুবিধা প্রদান করা হবে।

সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশে প্রণোদনা: সৃজনশীল অর্থনীতি – ফিল্ম, সঙ্গীত, অ্যানিমেশন, গেমিং, ডিজিটাল কনটেন্ট খাতের উন্নয়নে নীতি ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে।

রপ্তানিমুখী শিল্পে প্রণোদনা: ফার্মাসিউটিক্যালস, আইটি, চামড়া ও জুতা শিল্প, অ্যাগ্রো-প্রসেসিং – এ জাতীয় শিল্পে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানখাত সংস্কার

সুদহার যৌক্তিকরণ: ব্যাংক খাতের সুশাসন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সুদের হার যৌক্তিকীকরণ এবং আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর নীতি প্রণয়ন করা হবে। জনগণের ঘাড় থেকে বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা কমানো হবে।

অবসায়িত ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের অর্থ ফেরত: অবসায়িত ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের অর্থ দ্রুততম সময়ে সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়া হবে। আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ডিপোজিট প্রোটেকশন অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করা হবে, যার মাধ্যমে ডিপোজিট প্রোটেকশন ফান্ডের দায়িত্ব সম্প্রসারিত হবে এবং সংকটকালে বীমাকৃত আমানত স্থানান্তরের অর্থায়ন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পে-বক্স প্লাস মডেল বিবেচনা করা হবে।

'অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন' গঠন: অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও গবেষক, অভিজ্ঞ ব্যাংকার, কর্পোরেট নেতা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি 'অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন' গঠন করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে প্রবৃদ্ধির সুফল সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ করা হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শৃঙ্খলা, তাদারকি ও স্বচ্চতা নিশ্চিতকরণ: দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্বশাসন, ক্ষমতা ও তদারকি নিবিড় ও স্বচ্ছতা শক্তিশালী করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও ক্ষমতায়ন: বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর নজরদারি বৃদ্ধি করা হবে।

ব্যাংকিং ডিভিশন বিলুপ্তিকরণ: অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ডিভিশন বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ পরিচালনা ও তদারকির ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

ব্যাংকিং খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধকরণ: ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং ব্যাংক পরিচালনা নীতিমালা পারিবারিক প্রভাবমুক্ত করা হবে।

খেলাপি ঋণ সমাধান ও বীমা খাত উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ: অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চ খেলাপি ঋণ (নন-পারফর্মিং লোন) সমস্যা পর্যালোচনা করে দায়ীদের আইনের আওতায় আনা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বীমা খাতে গ্রাহক সুরক্ষা, তহবিল ব্যবস্থাপনার জবাবদিহি এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা নিশ্চিত করা হবে।

পুঁজিবাজার সংস্কার ও উন্নয়ন

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক নজরদারির আওতায় আনা হবে।

'পুঁজিবাজার সংস্কার কমিশন' গঠন: পুঁজিবাজারের সংস্কারকল্পে একটি 'পুঁজিবাজার সংস্কার কমিশন' গঠন করা হবে। পাশাপাশি, গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজারে সংঘটিত অনিয়ম তদন্তে একটি বিশেষ তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। বিএনপি শেয়ার বাজারে অনিয়ম ও জালিয়াতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শেয়ারবাজারের স্বচ্ছতা আনয়ন: সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডে যোগ্য, সৎ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হবে। পুঁজিবাজারে বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

শেয়ারবাজার কারসাজি বন্ধকরণ: বাজারে কারসাজি (ম্যানিপুলেশন), ইনসাইডার ট্রেডিং ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও কার্যকর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা, বিনিয়োগবান্ধব ও যুক্তিসংগত করনীতি প্রণয়ন এবং পুঁজিবাজারে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা হবে।

শক্তিশালী বন্ড ও ইক্যুইটি মার্কেট গঠন: শেয়ার বাজারের বিদ্যমান সমস্যাবলীর কার্যকর সমাধান করে দেশে একটি শক্তিশালী শেয়ার মার্কেট, বন্ড মার্কেট ও ইক্যুইটি মার্কেট গড়ে তোলা হবে। বিএনপির লক্ষ্য হলো – বিনিয়োগের গণতন্ত্রীকরণ ও 'সবার জন্য সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ' করা।

কর্পোরেট বন্ড ও সুকুক: এসএমই বোর্ড শক্তিশালী করা এবং কর্পোরেট বন্ড মার্কেট বিস্তৃত করা হবে। পর্যায়ক্রমে, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফাণ্ড (ইটিএফ), সুকুক (ইসলামিক বণ্ড), এবং গ্রীণ বন্ড চালু করা হবে। জলবায়ু সহনশীল প্রকল্পে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকার গ্রীণ বাংলাদেশ বণ্ড ইস্যু করা হবে।

প্রবাসীদের জন্য ইনভেস্টমেন্ট গেটওয়ে চালুকরণ: প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য এনআরবি ইনভেস্টমেন্ট গেটওয়ে চালু করা হবে।

পুঁজিবাজারে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ: পুঁজিবাজারে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মার্কেট ও পণ্য উভয়ই সম্প্রসারিত করা হবে। পুঁজিবাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারিদের সংখ্যা ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ফরেন পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট (এফপিআই)' অনবোর্ডিং পোর্টাল চালু করা হবে ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সংশ্লিষ্ট বিধান সমন্বয় করা হবে, যাতে বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

পুঁজিবাজারে প্রবেশাধিকার সহজলভ্যকরণ: বাংলাদেশের সকল জায়গা থেকে মার্কেট প্রবেশাধিকারকে সহজলভ্য করা হবে।

স্টার্টআপ ও এসএমই খাতের জন্য 'ডিজিটাল আইপিও এক্সপ্রেস' ব্যবস্থা চালুকরণ: স্টার্টআপ ও এসএমই খাতের জন্য দ্রুত ও সহজতর পদ্ধতিতে ৩০ দিনের মধ্যে তালিকাভুক্তির সুবিধাযুক্ত 'ডিজিটাল আইপিও এক্সপ্রেস' ব্যবস্থা চালু করা হবে।

'পুঁজিবাজার ট্রাইব্যুনাল' গঠন: বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একটি দ্রুত কার্যকর 'পুঁজিবাজার ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা এবং হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা ও বিনিয়োগকারী অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসার: কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাজার শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বাণিজ্য সহজীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ

অর্থনীতি উদারিকরণ ও বিনিয়ন্ত্রিতকরণ: মুক্তবাজার অর্থনৈতিক কাঠামো হবে শিল্প ও বাণিজ্য তথা অর্থনীতির মূল দর্শন। বিনিয়োগের পরিবেশকে বিনিয়ন্ত্রিতকরণ করে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। বাজার ব্যবস্থাপনাকে সিন্ডিকেট মুক্ত করা হবে এবং লালফিতার দৌরাত্ম কমিয়ে প্রকৃত ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট সম্পাদন: রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করে বাংলাদেশের অবস্থান শক্ত করতে আমরা প্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক জোট ও অঞ্চলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও মিনিলেটারাল পর্যায়ে কৌশলগত ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) গঠনে অগ্রাধিকার দেয়া। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে শুল্ক হ্রাস, অশুল্ক বাধা কমানো, বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদার করা হবে, যাতে রপ্তানি বৈচিত্র্য বাড়ে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদে টেকসইভাবে এগিয়ে যায়।

প্রতিযোগিতা সক্ষম বাণিজ্য গড়ে তোলা: স্বল্পোন্নত দেশভুক্ত থাকার কারণে বাংলাদেশ যে শুল্কমুক্ত বাজারপ্রবেশ, বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা ও উন্নয়ন সহায়তা পায়, তা ধাপে ধাপে নিজেদের সক্ষমতায় রূপান্তর করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। এজন্য রপ্তানি খাতের বৈচিত্র্য ও মানোন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি স্থানান্তর, নতুন পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যবহুমুখীকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, কর ও শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার, বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার এবং শিল্পখাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে সমন্বিত নীতি গ্রহণ করা হবে, যাতে

এলডিসি সুবিধা ছাড়াও বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে আত্মনির্ভর ও টেকসইভাবে টিকে থাকতে পারে।

রপ্তানিপণ্যের বৈচিত্র্যায়ন ও অর্থনৈতিক কূটনীতিতে গুরুত্বারোপ: তৈরি পোশাকের বাইরেও বাংলাদেশের হস্তশিল্প, গৃহসজ্জা, পাটপণ্য, প্রাকৃতিক প্রসাধনী, খেলনা ও শিশুপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নতুন বাজার অনুসন্ধান, বাজার বিস্তৃতিকরণ এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে গুরুত্বারোপ করা হবে।

বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে (অ্যামাজন, ই-বে, আলীবাবা, ইত্যাদিতে) সংযুক্তিকরণ: বাংলাদেশকে বিশ্ববাজারের ই-কমার্স হাবে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অনলাইনভিত্তিক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন ই-বে কিংবা আলীবাবার মতো বিশ্বখ্যাত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের চাহিদা অনুযায়ী দেশে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। এসকল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিভাবে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করা যায়, এ বিষয়ে অভিজ্ঞজনদের নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

লজিস্টিকস হাব প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে কেন্দ্র করে সমন্বিত লজিস্টিক হাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ উদ্যোগের আওতায় বন্দর অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, গভীর সমুদ্র বন্দর সক্ষমতা বৃদ্ধি, মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক (সমুদ্র–সড়ক–রেল–নদীপথ) একীভূতকরণ এবং ডিজিটাল কাস্টমস ও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে আধুনিক ওয়ারহাউজিং ও ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাপ্লাই চেইনের দক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

শিল্পখাত

বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ: শিল্প খাতের বিকাশে বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে। যেসব বিনিয়োগে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, সেই ধরনের প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। শিল্পখাতে বিনিয়োগ সহজ করতে, কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে ব্যাংকিং সাপোর্ট নিশ্চিতের লক্ষ্যে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' বাস্তবায়ন করা হবে।

বন্ধ শিল্প চালুকরণ ও রপ্তানিখাতে বৈচিত্র্য আনয়ন: পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকল সহ আওয়ামী দুঃশাসনে বন্ধ হয়ে যাওয়া মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলো পুনরায় চালুর দৃশ্যমান উদ্যোগ নেয়া হবে। এই লক্ষ্যে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে দ্রুত সরকারী, পাবলিক-প্রাইভেট যৌথ মালিকানা কিংবা ব্যক্তিমালিকানায় সব বন্ধ শিল্প চালু করা হবে।

বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসকরণ: ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের সময়ে উচ্চ আমদানি নির্ভরতা এবং দুর্বল রপ্তানি বৈচিত্র্যের কারণে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। বাণিজ্যনীতিকে পুনর্গঠন করে কাঁচামালের শুল্ক কাঠামো যৌক্তিক করা, প্রেফারেনশিয়াল চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন, এবং গুরুত্বপূর্ণ ইনপুটে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে তোলা হবে, যাতে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায়।

'ন্যাশনাল ট্রেড কম্পিটিটিভনেস কাউন্সিল' ও 'কৌশলগত টেক্সটাইল ফান্ড' গঠন: বাংলাদেশে একটি 'ন্যাশনাল ট্রেড কম্পিটিটিভনেস কাউন্সিল' গঠন করা হবে। পাশাপাশি, একটি কৌশলগত টেক্সটাইল ফান্ড গঠন করবো, যা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পের বিকাশে টেকসই, স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন নিশ্চিত করা যায়।

অর্থায়ন ও প্রনোদনা: শিল্পখাতে প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নে উৎসাহ দিতে ট্যাক্স হলিডে, যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের জন্য বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে। আমরা এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ন্যায্য ও সাশ্রয়ী অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে।

'ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড': অগ্রাধিকার খাতের জন্য 'ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড' থেকে স্বল্পসুদে ঋণ ও রপ্তানি গ্যারান্টি দেওয়া হবে। বন্দর সমূহের কাস্টমস, লজিস্টিক্স ও পরিদর্শন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক করে বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেড হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

'ন্যাশনাল গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি': 'ন্যাশনাল গ্রীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি'-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, বর্জ্য থেকে সম্পদ উৎপাদন এবং কম-কার্বন শিল্পায়নে প্রণোদনা দিয়ে গ্রীন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা হবে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: বিমসটেক, আসিয়ান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে নতুন বাজার-সুবিধা ও বিভিন্ন খাতে প্রেফারেনশিয়াল চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কারু ও হস্তশিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন

এক গ্রাম এক পণ্য-ফিরিয়ে আনবো হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য: সারাদেশে 'এক গ্রাম এক পণ্য' কর্মসূচি চালু করা হবে, যেখানে প্রতিটি গ্রাম তার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পণ্য যেমন সোনারগাঁর জামদানি, টাঙ্গাইলের শাড়ি, রাজশাহীর সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, ঝালকাঠির শীতলপাটি ইত্যাদিকে উৎপাদন-কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে। সরকার এই উদ্যোগে নকশা সহায়তা, অর্ডার-ভিত্তিক ঋণ ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ই-বাজার সংযোগ দেবে।

এর মাধ্যমে নারী ও তরুণসহ অতি দ্রুত লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

নারী-নেতৃত্বাধীন হস্তশিল্প উদ্যোক্তা অর্থনীতি: নারীদের নেতৃত্বে প্রতিটি হস্তশিল্প উদ্যোক্তাকে একত্র করে গ্রামীণ ও শহরভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে তোলা হবে। 'কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার', গুণগত মান সনদ ও ডিজিটাল বাজার সংযোগের মাধ্যমে ন্যায্য দাম ও রপ্তানি বাজারে অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে টার্গেটেড সাপোর্ট প্রদান: ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে টার্গেটেড সাপোর্ট কর্মসূচির আওতায় উদোক্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহায়তা ছাড়াও রপ্তানি, ডিজাইনিং, ব্রান্ডিং, এবং দেশি-বিদেশি মার্কেটপ্লেসে বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় প্লাটফর্ম সহায়তা প্রদান করা হবে।

সেবাখাত

বিশ্ব অর্থনীতি যখন ক্রমশ সেবাভিত্তিক খাতে এগোচ্ছে, বাংলাদেশ এখনো তার বিশাল সেবাখাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে পুরোদমে

কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে না। বিএনপি বিশ্বাস করে, উচ্চ আয়ের, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির পথে এগোতে হলে সেবা খাতের আধুনিকায়ন এবং কৌশলগত বিকাশ অপরিহার্য।

সেবাখাত উন্নয়নে সমন্বিত কৌশল গ্রহণ: বাংলাদেশের সীমিত ভূমির ব্যবহার ভিত্তিক আধুনিক সেবাখাত যেমন- ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, আইটি ইন্ডাস্ট্রি, বিনোদন শিল্প, পর্যটন শিল্প, পরিবহন, টেলিকমিউনিকেশন, দূর-শিক্ষণ, এয়ার-হাব, ওয়াটার হাব, সিকিউরিটি সার্ভিস, বন্দর ও জাহাজ, স্বাস্থ্যসেবা, টেলি-মেডিসিন ইত্যাদি সমৃদ্ধ করার সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হবে। বহুজাতিক প্রযুক্তি কোম্পানিকে আঞ্চলিক সদরদপ্তর বা গবেষণা সেন্টার স্থাপনে প্রণোদনা দেওয়া হবে। সব সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স, ট্যাক্স সার্টিফিকেট, এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন এক জায়গায় প্রাপ্তির জন্য একটি ডিজিটাল সিঙ্গেল উইন্ডো গড়ে তোলা হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৈচিত্র্য বৃদ্ধিকরণ: সেবাখাতকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, উদ্ভাবন এবং রপ্তানিমুখী শক্তিতে রূপান্তর করে দেশে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। ফলে রপ্তানি বৈচিত্র্য বাড়াবে।

আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন ও ব্র্যান্ডিংয়ে সহায়তা প্রদান: স্থাপত্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, কনসালটেন্সি, স্বাস্থ্যসেবার মতো পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন ও ব্র্যান্ডিংয়ে সহায়তা করা হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন

গত দেড় দশকে সীমাহীন দুর্নীতি, অস্বচ্ছ ক্রয়প্রক্রিয়া, ব্যয়বহুল স্বল্পমেয়াদি চুক্তি, আত্মঘাতী ক্যাপাসিটি চার্জ এবং অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতার ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত ব্যয়বহুল, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। বিএনপি বিশ্বাস করে, দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা ছাড়া শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। বিএনপির লক্ষ্য হলো জাতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে দেশীয় সম্পদের স্বচ্ছ, দক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ–জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ক. বিদ্যুৎ খাত

উৎপাদন ও সঞ্চালন সক্ষমতা বৃদ্ধি: ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা এবং সঞ্চালন লাইন ২৫,০০০ সার্কিট কিলোমিটারে সম্প্রসারণ করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি উৎপাদনের ভারসাম্য নিশ্চিত করা হবে এবং অদক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্র আধুনিকায়ন করা হবে। সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের পূর্ণাঙ্গ আধুনিকায়ন এবং স্মার্ট গ্রিড উন্নয়নের মাধ্যমে সিস্টেম লস কমিয়ে সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হবে।

ক্যাপাসিটি চার্জ ও চুক্তি সংস্কার: ফ্যাসিস্ট সরকারের নজিরবিহীন দুর্নীতির কারণে জাতির উপর জ্বালানি খাতে বিশাল অঙ্কের দায় এসে পড়েছে। ক্যাপাসিটি চার্জসহ রেন্টাল ও স্বল্পমেয়াদি চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক ব্যয় হ্রাস এবং স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

লিস্ট কস্ট জেনারেশন ও জ্বালানি মিশ্রণ: সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে সর্বোত্তম জ্বালানি মিশ্রণ নিশ্চিত করা হবে।

জ্বালানি দক্ষতা ও এনার্জি অডিট: গৃহস্থালি, শিল্প ও সরকারি–বেসরকারি খাতে এনার্জি অডিট চালু করা হবে এবং জ্বালানি–দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রণোদনা দেওয়া হবে।

আমদানি নির্ভরতা হ্রাস: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আমদানি নির্ভরতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে দেশীয় উৎস ও আমদানির মধ্যে বাস্তবসম্মত ভারসাম্য আনা হবে।

খ. জ্বালানি খাত

গোপন চুক্তির অবসান: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্রয়ে কোনো গোপন চুক্তি করা হবে না এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে। বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি জাতীয় স্বার্থ, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও যৌক্তিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

ক্রুড অয়েল রিফাইনারি নির্মাণ: চট্টগ্রাম বা উপকূলীয় শিল্পাঞ্চলে ধাপে ধাপে ৫০ লক্ষ টন পরিশোধন সক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ক্রুড অয়েল রিফাইনারি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও বাপেক্স শক্তিশালীকরণ: ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও কূপ খননে বাপেক্সকে শক্তিশালী করে স্থল ও সমুদ্রভিত্তিক গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করা হবে এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর কাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

স্বচ্ছ ট্যারিফ ব্যবস্থা: জ্বালানির দাম সাশ্রয়ী ও স্বচ্ছ রাখতে ট্যারিফ নির্ধারণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা জোরদার করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া চালু করা হবে।

গ্যাস বিতরণ ও মূল্যনীতি সংস্কার: গৃহস্থালি ও শিল্পখাতে গ্যাসের ন্যায্য, নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিতরণ কাঠামো ও মূল্যনীতি পর্যালোচনা করা হবে।

আন্তঃদেশীয় জ্বালানি সংযোগ: আঞ্চলিক ও আন্তঃদেশীয় গ্যাস পাইপলাইন ও জ্বালানি সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।

জ্বালানি বৈষম্য হ্রাস: দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগণকে জ্বালানি বৈষম্যমুক্ত করার লক্ষ্যে সোলার হোম সিস্টেম, মাইক্রো-গ্রিড ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

গ. নবায়নযোগ্য জ্বালানি

সবুজ অর্থায়ন ও কর প্রণোদনা: নবায়নযোগ্য শক্তি ও শক্তি দক্ষতায় কর রেয়াত ও স্বল্পমূল্যের সবুজ অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ বৃদ্ধি: ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

পানি–বিদ্যুৎ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা: আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বল্প ব্যয়ে পানি–বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পারমাণবিক শক্তি: পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সম্ভাবনা বিবেচনা করে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

রূপপুর প্রকল্প পর্যালোচনা: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যকারিতা পুনঃপরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি তদন্ত করা হবে।

বর্জ্য থেকে শক্তি: নগর, বন্দর ও শহরের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ও দূষণ কমাতে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন প্রকল্প চালু করা হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত হবে বিএনপির বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন চালিকশক্তি । 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতির আলোকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৪.০ এবং এআই প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ভিত্তির উপর ভিত্তি করে একটি ভবিষ্যৎমুখী, গতিশীল ও প্রযুক্তিগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। এই রূপকল্পের মূল লক্ষ্য: প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ, শিক্ষার্থী, ফ্রিল্যান্সার, আইটি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরকে সেবা প্রদান করা এবং আমাদের দেশকে বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রযুক্তি নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, কোটি তরুণ -তরুণীদের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের উন্নত, দক্ষ, ও বহুমুখী আইসিটি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

এআই এবং হার্ডওয়্যার হাব: বাংলাদেশকে বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি অন্যতম এআই হাব এবং হার্ডওয়্যার উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

১০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান: আইসিটি খাতকে দ্রুত সক্রিয় করে সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, সাইবার নিরাপত্তা, বিপিও, এআই-ডেটা, সেমিকন্ডাক্টর, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ সহ পাঁচটি খাতে সরাসরি দুই লক্ষ এবং ফ্রিল্যান্সিং ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আরও আট লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। উদ্ভাবন এবং আইসিটি পরিষেবা রপ্তানিকে সর্বোচ্চ উৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে আইসিটি খাতের অবদান ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ এ উন্নীত করা হবে।

সবার জন্য দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট: দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শহরে এবং গ্রামে নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে। ওয়্যারলেস এবং ফাইবার-অপ্টিক ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে এমন এক সুদৃঢ় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে, যাতে প্রতিটি মানুষ বিশ্বের সেরা আইসিটি সেবা গ্রহণ করতে পারে বাড়িতে, স্কুল-কলেজে এবং ব্যবসা কেন্দ্রে এবং বৈশ্বিক প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ পায়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও ডিজিটাল সেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশের সকল স্কুল-কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়, গ্রামীণ ডিজিটাল সেন্টার, হাসপাতাল, রেল স্টেশন এবং বিমানবন্দরসহ প্রধান জনবহুল স্থানগুলোতে বিনামূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হবে।

বৈশ্বিক ইন্টারনেট সংযোগ ও অবকাঠামো: ভবিষ্যতের গ্রাহক ও ব্যবসায়িক চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী 'কানেক্টিভিটি মাস্টারপ্ল্যান' বাস্তবায়ন করা হবে। এই পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হবে: সর্বোত্তম মানের সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ; পর্যাপ্ত লো-অরবিট স্যাটেলাইট ব্যাকআপ ব্যবস্থা, এবং বহুমুখী আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট হাবের সাথে কার্যকর সংযুক্তি। আমাদের লক্ষ্য হবে ৯৯.৯৯৯% নেটওয়ার্ক রিলায়েবিলিটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন, দ্রুততম ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়া।

সফটওয়্যার, অ্যাপ ও হার্ডওয়্যার শিল্পে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাওয়া দেশের সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও বিপিও শিল্পকে শক্তিশালী করতে আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করে "মেইড ইন বাংলাদেশ/ এসেম্বল্ড ইন বাংলাদেশ/ সার্ভিসড ইন বাংলাদেশ" উদ্যোগ চালু করতে চায়, যাতে এসব পণ্য ও সেবা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রথম সারিতে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

জাতীয় সাইবার নিরাপত্ত, সাইবার বুলিং ও নাগরিক তথ্য সুরক্ষা: সকল নাগরিকদের সাইবার নিরাপত্ত, সাইবার বুলিং এবং তথ্য ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল অবকাঠামো রক্ষায়, দেশি-বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা ও আইন করতে চায় বিএনপি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের নিরাপত্তা সমন্বয়ে একটি জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে যাতে, শিশু, শিক্ষার্থী, মহিলা বা পুরুষ সাইবার বুলিং থেকে কোনও হয়রানির সম্মুখীন না হন। এবং যদি এমন কিছু হয়, তাহলে যে কোনোও ভুক্তভোগী যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে পারেন, যারা মূল সমস্যাটি সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারেন।

পে'পালসহ প্রযুক্তিভিত্তিক ক্যাশ-লাইট অর্থনীতি: বিএনপি সরকার পরিচালনার সুযোগ পেলে ফ্রিল্যান্সার ও প্রযুক্তিবিদদের সুবিধার জন্য পে'পাল সহ জাতীয় ই-ওয়ালেটচালু করবে, যাতে দৈনন্দিন কেনাকাটা, বিল, ফি, কর—সবই সহজে ডিজিটালভাবে পরিশোধ করা যায় এবং ফ্রিল্যান্সার বা তরুণ আইসিটি উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিদেশ থেকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ গ্রহণের জন্য কোনোও ব্যাংকিং জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না।।

এআই-চালিত ডাটা সেন্টার ক্যাম্পাস, এজ ডাটা সেন্টর ও ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব: ক্লাউড-ফার্স্ট প্রযুক্তি আওতায় দেশে প্রথম এআই-চালিত ডেটা সেন্টার ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে। এটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেবাকে নিরাপদ, দ্রুত এবং স্কেলযোগ্য অবকাঠামো প্রদান করবে। বাংলাদেশকে গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন ও মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠানের 'এজ ডেটা সেন্টার হাব' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে। এর ফলে দেশের ডেটা দেশেই থাকবে, ব্যান্ডউইডথ আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং প্রকৃত ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিনিয়োগবান্ধব নীতি, স্টার্টআপ, ও উদ্ভাবন ফান্ড: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি দীর্ঘ মেয়াদি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি সম্পাদন করা হবে। এর অধীনে বিনিয়োগকারীদের জন্য নিশ্চিত করা হবে আইসিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ বছর মেয়াদি কর সুবিধা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ; এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা। আইটি ইনোভেশন ফান্ডের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিভাবান যুবসমাজ ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সফটওয়্যার ও আইটি সার্ভিস

সেক্টরে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হবে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান "স্টার্টআপ তহবিল" বিস্তৃত করা হবে। এর আওতায় ভর্তুকিযুক্ত ঋণ, ইকুইটি সহায়তা এবং নানাবিধ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে। পুঁজিবাজার: আইসিটি শিল্পের বিকাশে পুঁজিবাজারভিত্তিক মিউচুয়াল ফান্ড এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল গঠনে বিশেষ উৎসাহ ও নীতিগত সহায়তা দেওয়া হবে। স্টার্টআপে জাতীয় ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম: তথ্যপ্রযুক্তি খাতে স্টার্টআপ ও যুব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে নাগরিক বিনিয়োগভিত্তিক জাতীয় ক্রাউডফন্ডিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা হবে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য স্টার্টআপ খাতে নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের আইনি কাঠামো তৈরি করা হবে।

উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ও সাশ্রয়ী সেবা নিশ্চিতকরণ: ভিওআইপি, ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) মার্কেট ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উন্মুক্ত করে দেয়া হবে; এর ফলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, দক্ষতা বাড়বে এবং ইন্টারনেট ব্যয় হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গৃহীত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং লাইসেন্সিং নীতি ২০২৫ এর সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করা হবে এবং আইনের ভালো দিকগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে এবং বিতর্কিত দিকগুলো পুনঃনিরীক্ষা ও সংশোধন করা হবে।

যোগাযোগ ও পরিবহন খাত

পরিবহন খাতে অদক্ষতা ও বিশৃঙ্খলার কারণে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার মুখে। বিএনপি মনে করে, বিশ্বমানের মাল্টিমোডাল পরিবহন ব্যবস্থা একটি আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি। আমাদের লক্ষ্য, সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও টেকসই পরিবহন মাধ্যমগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক সংযোগ জোরদার করা এবং সবার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী চলাচল নিশ্চিত করা। একই সাথে একটি সমন্বিত, দক্ষ ও সবুজ পরিবহন করিডোর গড়ে তোলা।

ক. সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড গড়ে তোলা: দেশের সকল জেলা ও প্রধান শহরসমূহকে সংযুক্ত করা হবে। চার লেন বিভক্ত মহাসড়ক, নিয়ন্ত্রিত প্রবেশপথ (ইন্টারসেকশন) এবং স্থলবন্দর, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সীমান্ত সংযোগসহ একটি জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড গড়ে তোলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের সড়ক অবকাঠামোকে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

নিরাপত্তা, সুশৃঙ্খল ও রুট রেশনালাইজেশন: সড়ক যোগাযোগে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও স্মার্ট ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা হবে। নগর পরিকল্পনা ও পরিবহন নীতির সমন্বয়ে বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

যানজট নিরসন ও গণপরিবহনের মান-উন্নয়ন: যানজট নিরসনের লক্ষ্যে গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন, জনবহুল নগরসমূহে পাবলিক ট্রান্সপোর্টকে অধিকতর কার্যকর ও সহজলভ্য করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই লক্ষ্যে ঢাকাস্থ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ও অবৈধ ট্রাক স্ট্যান্ড গুলোকে পর্যায়ক্রমে ঢাকার বাইরে উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অ্যাক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ এবং ওভারপাস-আন্ডারপাস নির্মাণ: মহাসড়ক অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষার্থে অ্যাক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও স্মার্ট মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন এবং যানজটপূর্ণ ইন্টারসেকশনগুলোতে প্রয়োজনীয় ওভারপাস ও আন্ডারপাস নির্মাণ করা হবে।

সেতু নির্মাণ: পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, দ্বিতীয় যমুনা সেতু, এবং ঢাকা–চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

গ্রামাঞ্চলের সড়কে উন্নয়ন: সকল কাঁচা গ্রামীণ সড়ক ধাপে ধাপে পাকা করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'লাস্ট মাইল' সংযোগ নিশ্চিত করা হবে, যাতে গ্রাম হতে আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়ক ও বাণিজ্যিক করিডোরে সরাসরি যাতায়াত সম্ভব হয়।

পৃথক লেন ও সড়ক দখলমুক্তকরণ: দুই চাকার যানবাহনের জন্য পৃথক লেন তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে। রাস্তা ও ফুটপাতকে দখলমুক্ত করা এবং অনিরাপদ, ধীরগতি এবং চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত যানবাহন ধাপে ধাপে অপসারণ করা হবে।

রাইড শেয়ারিং সাইকেল সেবা চালু: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে যানযট নিরসন ও পরিবেশবান্ধব কর্মসূচির আওতায় রাজধানী ঢাকায় মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক বিশেষ রাইড শেয়ারিং সাইকেল সেবা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থা অন্যান্য শহরগুলোতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সড়ক নিরাপত্তা আইন ও সড়ক দুর্ঘটনারোধ: সড়ক দুর্ঘটনারোধে একটি সমন্বিত ও টেকসই কৌশল গ্রহণ করা হবে। সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স নিশ্চিত করা, যানবাহনের ফিটনেস নিশ্চিতকরণ, এবং জনসচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়কে শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে হবে। এজন্য একটি শক্তিশালী 'সড়ক নিরাপত্তা আইন' প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হবে।

যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: সড়ক ও মহাসড়কে ছিনতাই, চুরি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমনে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সড়ক পরিবহন বীমা: যাত্রী, যানবাহনের ড্রাইভার, ও সহকারী আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিহত কিংবা আহত হলে তাদের ক্ষতিপূরণ, সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেকটি যানবাহনকে পর্যায়ক্রমে বীমার আওতায় আনা হবে।

সড়ক পরিবহণ শ্রমিকদের ইউনিফর্ম: পেশা হিসেবে সামাজিক সম্মানের স্বীকৃতি প্রদান, যাত্রাপথে হয়রানি প্রতিরোধ এবং যাত্রী সেবায় শৃঙ্খলা আনয়ন করতে ড্রাইভার ও হেল্পারদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরিধান নিশ্চিত করার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খ. নৌপরিবহন ব্যবস্থা

বৃত্তাকার জলপথ গড়ে তোলা: নদীনির্ভর শহরসমূহের চারপাশে বৃত্তাকার জলপথ গড়ে তোলার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খালখনন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, যাতে সড়ক যানজট হ্রাস, নদীভিত্তিক পরিবহন পুনরুজ্জীবন এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করা যায়।

নদী ও সমুদ্র বন্দরের সাথে নৌ-যোগাযোগ উন্নয়ন: বুড়িগঙ্গা, গোমতী,

পদ্মা ও মেঘনা নদীতে পর্যায়ক্রমে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল নির্মাণ করে উভয় পাড়ের চলাচল আরও সহজ, গতিময় ও নিরাপদ করা হবে। যমুনা নদীর পুরাতন জগন্নাথগঞ্জ ঘাট এলাকায় আন্ডার গ্রাউন্ড টানেল নির্মাণ করে সিরাজগঞ্জের সাথে সংযুক্ত করা হবে। বঙ্গোপসাগরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পরিবহন প্রবাহের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

আধুনিক 'ওয়াটার হাইওয়ে' রূপান্তর: বিশেষ নদীপথকে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির 'ওয়াটার হাইওয়ে' হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, হাতিয়া, স্বন্দীপের মতো কেন্দ্রে আধুনিক রিভার পোর্ট ও ইন্টারমোডাল টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।

উপকূলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন দ্বীপসমূহের সাথে মূল ভূ-খণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সুগম করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকূলীয় জাহাজ ও ফেরী চালু করা হবে।

নৌ-পথে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: নদী পরিবহনে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা, তদারকি ও প্রয়োগ কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। ঢাকাসহ নদীঘেঁষা প্রধান শহরসমূহে চাহিদা ও ভৌগোলিক সম্ভাবনার ভিত্তিতে নতুন যাত্রী ও পণ্য টার্মিনাল স্থাপন করা হবে।

গ. রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা

আভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণ: রেলকে জাতীয় পরিবহনের কেন্দ্রীয় মেরুদণ্ড হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা–পঞ্চগড়, ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ করিডোরে বিদ্যুতায়ন ও ডাবল-লাইন নির্মাণকে জাতীয় মিশন হিসেবে নেওয়া হবে। দেশের সকল জেলা ও প্রধান শহরসমূহকে একটি সমন্বিত রেল নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ঢাকা ও অন্যান্য মহানগরে মনোরেল, মেট্রোরেল, বৃত্তাকার কমিউটার লাইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আঞ্চলিক সংযোগ জোরদারে মিয়ানমার হয়ে ঢাকা-কুনমিং রেল সংযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এক্সপ্রেস সার্ভিস বৃদ্ধি ও রেলপরিচালনার আধুনিকায়ন: প্রধান প্রধান আন্তঃনগর রুটে আরো অধিক সংখ্যক এক্সপ্রেস সার্ভিস চালু করা হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উৎসাহিতকরণ: যাত্রী ও মালবাহী করিডোর ও নগর রেল ব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করে অবকাঠামো ও সেবার মান উন্নত করা হবে। নিরাপত্তা, দক্ষতা ও নিয়মশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য স্মার্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

মেট্রোরেল ও দূরপাল্লার পরিবহনে শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী ও ৬০ বছরের অধিক বয়স্কদের জন্য বিশেষ ছাড়: মেট্রোরেল এবং দূরপাল্লার সকল পরিবহনে শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী ও ৬০ বছরের অধিক বয়স্কদের জন্য বিশেষ ছাড় প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

বুলেট ট্রেন সংযোগ স্থাপন: পর্যায়ক্রমে এক ঘন্টার মধ্যে রাজধানী ঢাকাকে প্রধান আঞ্চলিক শহরগুলোর সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে উচ্চগতির রেল নেটওয়ার্ক (বুলেট ট্রেন) সংযোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

ঘ. বিমান পরিবহন ব্যবস্থা

এভিয়েশন হাবে রূপান্তর: ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাবে রূপান্তর করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় এয়ার কানেকটিভিটি গ্রিড তৈরি করা হবে, যেখানে প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহর ও পর্যায়ক্রমে জেলা শহরগুলোকে সংযুক্ত করতে ছোট বিমানবন্দর ও এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণ করা হবে।

নিরাপদ কার্গো সেবা নিশ্চিতকরণ: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ লজিস্টিক ও যাত্রী হাবে উন্নীত করা হবে। কক্সবাজার, যশোর, রাজশাহী ও সৈয়দপুরে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে গড়ে তোলা হবে। একীভূত কার্গো ট্র্যাকিং, বুকিং ও রুট পরিকল্পনার জন্য জাতীয় লজিস্টিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হবে। বিমানবন্দরগুলোতে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

হয়রানিমুক্ত যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ: দেশের সকল বিমানবন্দরে নিরাপদ, সম্মানজনক ও হয়রানিমুক্ত যাত্রীসেবা নিশ্চিত করা হবে। টিকিট কালোবাজারি, জালিয়াতি ও অবৈধভাবে অর্থ আত্মসাৎ রোধ করা হবে।

বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণতকরণ: জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে লাভজনক ও প্রতিযোগিতাসক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালন কাঠামো, রুট ব্যবস্থাপনা এবং সেবার মানে কাঠামোগত সংস্কার আনা হবে। আন্তর্জাতিক রুটে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্প্রসারণ করা হবে।

বেসরকারি এয়ারলাইনসমূহকে নীতিগত সহায়তা প্রদান: বেসরকারি এয়ারলাইনসমূহকে নীতিগত সহায়তা প্রদান করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে ও প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করা হবে। এভিয়েশন প্রযুক্তি এবং কার্গো খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং এই সেক্টরে দুর্ঘটনা রোধে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এভিয়েশন শিক্ষায় গুরুত্বারোপ: দেশের এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এবং দেশীয় এভিয়েশন খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সুনীল অর্থনীতি

বিএনপি দেশের অপার সম্ভাবনাময় সমুদ্রসম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু সহনশীলতা অর্জন করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রভিত্তিক শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনে গুরুত্বারোপ করা হবে।

খাদ্য, জ্বালানি ও কর্মসংস্থানের গুরুত্বারোপ: সুনীল অর্থনীতিকে

জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকার এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সুনীল অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে। সামুদ্রিক সম্পদ জরিপ ও মজুদভিত্তিক আহরণ নীতি চালু করে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, নবায়নযোগ্য শক্তি, মৎস্য আহরণ, দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনা ও জাহাজ **নির্মাণ শিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।**

পরিমিত মৎস্য আহরণ ও লুণ্ঠন প্রতিরোধ: দেশের সমুদ্র সম্পদের পরিমিত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। মৎস্য আহরণে আধুনিক জাহাজের ব্যবহার এবং মৎস সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। গভীর সমুদ্রে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হবে। পাশাপাশি, গভীর সমুদ্রে নজরদারি ও টহল ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে দেশীয় জেলেদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বৈরী শক্তির লুণ্ঠন থেকে সমুদ্র-সম্পদ রক্ষা করা হবে।

সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বারোপ: সামুদ্রিক শৈবালসহ আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন অন্যান্য সামুদ্রিক খাবার চাষে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে মেরিন ফিশারিজ ও সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়াজাতের মতো অর্থকরী শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ তৈরি হবে।

তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: সমুদ্র ব্লকগুলোর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের অংশীদারিত্বে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। নিজস্ব জ্বালানি উৎপাদনের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

সুনীল কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন: উপকূলীয় তরুণ প্রজন্ম ও জেলে পরিবারসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমন্বিত সুনীল কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ব্লু এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম) তৈরি করা হবে। উপকূলীয় এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের ইকো-ট্যুরিজম শিল্প গড়ে তুলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে।

'জাতীয় সুনীল অর্থনীতি কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা: নীতি সমন্বয়, লাইসেন্সিং নিয়ন্ত্রণ ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহজীকরণ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে 'জাতীয় সুনীল অর্থনীতি কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হবে। সামুদ্রিক সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য 'বিশেষায়িত গবেষণা সেল' গড়ে তোলা হবে।

নিরাপদ জাহাজ ভাঙ্গা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশ: জাহাজ ভাঙ্গা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষা ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে বাংলাদেশকে নতুন জাহাজ রপ্তানির হাবে পরিণত করা হবে। পাশাপাশি, গ্রীন শিপ-ব্রেকিং ট্রানজিশন কার্যকর করে হংকং কনভেনশন মানের নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব শিপ রিসাইক্লিং নিশ্চিত করা হবে।

শিক্ষা ও শিল্পখাতে 'মেরিটাইম ইনোভেশন ফান্ড' প্রতিষ্ঠা: বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাতের অংশীদারিত্বে সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন তহবিল 'মেরিটাইম ইনোভেশন ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করা হবে। ব্লু ফাইনান্স কাঠামো গড়ে 'ব্লু -বন্ড' এবং 'টেকসই সামুদ্রিক বিনিয়োগ ফান্ড' চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

শিল্পের কাঁচামাল: সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারে সমুদ্রের বিভিন্ন অণুজীব, শৈবাল ও রাসায়নিক পদার্থ থেকে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে।

বন্দর উন্নয়ন ও সুনীল অর্থনীতিতে জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা: জাতীয় শিপিং, নৌবহর পুনর্গঠন, বন্দর আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্য সহজীকরণ করা হবে। নাবিক প্রশিক্ষণ আধুনিক করে আন্তর্জাতিক চাকরি নিশ্চিত করা হবে। সমুদ্র আহরন ও উপকূল সুরক্ষায় বনায়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

'জাস্ট ট্রানজিশন ফ্রেমওয়ার্ক'-কে অগ্রাধিকার প্রদান: সমুদ্র-ভিত্তিক সম্পদ আহরণ ও সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে 'জাস্ট ট্রানজিশন ফ্রেমওয়ার্ক-কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যাতে সমুদ্র-সম্পদ আহরণ কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলে শিল্পায়ন করতে গিয়ে জনগণ, তাদের জীবিকা এবং পরিবেশের ক্ষতি সাধিত না হয়।

বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা: সামুদ্রিক অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য (ফ্লোরা ও ফনা) রক্ষা, টেকসই আহরণ, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সৃজনশীল অর্থনীতির উন্নয়ন

বিএনপি'র লক্ষ্য দেশের সৃজনশীল শিল্পের বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা। এই সম্ভাবনাময় খাতটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, জাতীয় ব্র্যান্ড এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে অবদান রাখবে।

জিডিপি'র ১.৫ শতাংশ অর্জন ও পাঁচ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি: সৃজনশীল অর্থনীতি খাতসমূহ যথা ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি, অ্যানিমেশন, ভিএফএক্স, গেমিং, ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য কন্টেন্ট তৈরি, ইউটিউব, টিকটক, পোশাক এবং নকশা, মেকআপ, চলচ্চিত্র ও মঞ্চ শিল্পকলা, ক্রিয়েটিভ মিডিয়া সেবাদাতা সফটওয়্যার কোম্পানি এবং ইনফ্লুয়েন্সার অর্থনীতি ইত্যাদির উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই খাতের অবদান ১.৫ শতাংশে উন্নীত করতে এবং উচ্চ দক্ষতা–নির্ভর ভবিষ্যতমুখী খাতে পাঁচ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে নানামুখী কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে।

আঞ্চলিক সৃজনশীল হাব গঠন ও প্রণোদনা প্রদান: দেশজুড়ে আঞ্চলিক সৃজনশীল হাব গড়ে তোলা হবে। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য এবং রপ্তানি-প্রস্তুত বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য পারফরম্যান্স-ভিত্তিক গ্রান্ট স্কীম চালু করা হবে।

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ও তহবিল গঠন: সৃজনশীল অর্থনীতির খাতগুলোর উন্নয়নে ১০ বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এই পরিকল্পনা আধুনিক স্টুডিও, ইনোভেশন হাব নির্মাণ, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, বৃত্তি এবং বৈশ্বিক বিপণন কার্যক্রম জোরদার করতে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করা হবে।

জাতীয় ব্রান্ড চালুকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন: বাংলাদেশী কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও এই খাত সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সক্রিয় সহায়তা দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক উৎসব ও বাজারে সৃজনশীল সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে 'ক্রিয়েটেড ইন

বাংলাদেশ' নামে জাতীয় ব্র্যান্ড চালু করা হবে। সৃজনশীল অর্থনীতি খাতে কৌশলগত নেতৃত্ব দিতে 'বাংলাদেশ ক্রিয়েটিভ ডেভলপমেন্ট অথরীতি' গঠন করা হবে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

বিএনপি মনে করে, কার্যকর রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হলো রাজস্ব ব্যবস্থার ওপর নাগরিক আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কর তখনই বৈধতা পায়, যখন তা ন্যায্যভাবে আদায় হয় এবং দৃশ্যমানভাবে জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের রাজস্ব সংকটের মূল সমস্যা কারিগরি নয়। বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক অর্থনীতির ফল। বিএনপি এই কাঠামো ভেঙে আয়কর ও ভ্যাট ব্যবস্থাকে ন্যায্য, সর্বজনীন ও প্রযুক্তিনির্ভর করার মাধ্যমে রাজস্ব ভিত্তি সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৫ শতাংশ কর–জিডিপি অনুপাত অর্জন: ২০৩৫ সালের মধ্যে কর–জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। করের বোঝা না বাড়িয়েই বাস্তবসম্মত ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

স্বল্পমেয়াদে দুই শতাংশে উন্নীতকরণ: ভ্যাট হার একীভূত করা ও ভ্যাট অব্যাহতি যৌক্তিকভাবে সীমিত করা, ন্যূনতম টার্নওভার করের হার সমন্বয়, তামাকজাত পণ্যের জন্য আধুনিক আবগারি আইন প্রণয়ন এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী আমদানিকৃত মোটর জ্বালানিতে দূষণ ব্যয়সহ আবগারি কর আরোপের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদে জিডিপির দুই শতাংশের বেশি অতিরিক্ত রাজস্ব অর্জন করা হবে।

মধ্য-মেয়াদে ১০ শতাংশে উন্নীতকরণ: কর প্রশাসনে দৃশ্যমান সংস্কার ও রাজস্ব আহরণ জোরদারে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। কর-জিডিপি অনুপাত বর্তমান থেকে বৃদ্ধিকরে ১০ শতাংশে উন্নীতকরণ করা হবে।

রাজস্বের ন্যায্যতা ও রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসযোগ্যতা পুনর্গঠন: বাংলাদেশে কর সংস্কারের প্রধান বাধা রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামো। আয়কর ব্যবস্থার আওতা সংকীর্ণ রেখে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে কর সুবিধার বাইরে রাখা হয়েছে। বিএনপি এই বৈষম্যমূলক কাঠামোর অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উচ্চ আয়ের ব্যক্তি, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও সম্পত্তির মালিকদের করজালের আওতায় আনা হবে এবং ডিজিটাল ব্যবস্থা, তথ্য বিনিময় ও ঝুঁকিভিত্তিক নিরীক্ষার মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ করা হবে। একই সঙ্গে কর ছাড় ও প্রণোদনা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হবে। ভ্যাট ব্যবস্থাকে সহজ, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করা হবে।

ব্যয় শৃঙ্খলা-কৃচ্ছ্রসাধন নয়, অপচয়ের অবসান: বিএনপি কৃচ্ছ্রসাধনের নামে জনকল্যাণমূলক ব্যয় কমানোর নীতিতে বিশ্বাস করে না। তবে অপচয়, অদক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রদর্শনমূলক ব্যয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবে। বিগত সময়ের ব্যয়বহুল মেগা প্রকল্পগুলো কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার তুলনায় অপ্রতুল ফল দিয়েছে। ভবিষ্যতে সব বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়–লাভ বিশ্লেষণ, সংসদীয় নজরদারি ও স্বচ্ছ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি: বিএনপি বিশ্বাস করে, কর্মসংস্থান ছাড়া অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অর্থহীন। তাই রাজস্ব ব্যয়ের মূল লক্ষ্য হবে কাজ সৃষ্টি। শ্রমঘন খাতে বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পুনর্জাগরণ, গ্রামীণ অবকাঠামো, নগর সেবা ও সবুজ অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয় কর্মসংস্থানের গতি ফিরিয়ে আনবে।

ট্রিলিয়ন-ডলার সক্ষম অর্থনীতির অর্থায়ন: দীর্ঘমেয়াদি পুনর্গঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে উৎপাদনশীল জনকল্যাণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নগর ব্যবস্থা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়ানো হবে, যা ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তির দক্ষতা ও অর্থনীতির করভিত্তি উভয়ই সম্প্রসারিত করবে। শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ পরিবেশ সংস্কার করে একক রপ্তানি নির্ভরতা কমানো হবে। পুঁজিবাজার সংস্কারের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকের সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

প্রজন্মের জন্য ন্যায্যতা ও নিরাপত্তা: বিএনপি নতুন আর্থিক সামাজিক চুক্তির প্রস্তাব দিচ্ছে—যেখানে কর হবে ন্যায্য, ব্যয়ের সুফল হবে দৃশ্যমান এবং নীতি হবে ভবিষ্যৎমুখী। এই চুক্তির লক্ষ্য অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণ, রাষ্ট্রের ওপর মানুষের আস্থা পুনর্গঠন এবং প্রজন্মান্তরের জন্য একটি স্থিতিশীল, সহনশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ।

ট্রিলিয়ন-ডলার অর্থনীতি কোনো শ্লোগান নয়। এটি একটি সচেতন রাজনৈতিক ও নৈতিক সিদ্ধান্ত। বিএনপি সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—যাতে রাষ্ট্র আবার জনগণের হয়, রাজস্ব হয় উন্নয়নের হাতিয়ার এবং আর্থিক নীতি হয় সমগ্র জাতির কল্যাণের ভিত্তি।

রাজস্ব বৃদ্ধির কৌশল

বিএনপি'র রাজস্ব কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু হলো বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং অভ্যন্তরীণ বাজার শক্তিশালীকরণ। ফলে উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়ে, কর্মসংস্থান ও আয় বেড়ে, ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে এবং সেই সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেই কর রাজস্ব টেকসইভাবে বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে কর ছাড় ও প্রণোদনাকে বাস্তব বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে রাজস্ব ক্ষয় রোধ করা হবে। সম্পত্তি ও সম্পদমূল্যের বৃদ্ধিকে আধুনিক সম্পত্তি করের মাধ্যমে করভিত্তিতে আনা হবে এবং উৎপাদন ও বিনিয়োগ থেকে সৃষ্ট সম্পদও রাষ্ট্রীয় আয়ে প্রতিফলিত হয়।

বিনিয়োগ–উৎপাদন–কর্মসংস্থান–ভোগ–কর চক্র সক্রিয়করণ: বাংলাদেশের রাজস্ব সংকটের মূল কারণ কেবল কর প্রশাসনের দুর্বলতা নয়; বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংকীর্ণতা। বিএনপি'র দৃষ্টিতে রাজস্ব বৃদ্ধি অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের ফল। বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও ভোগের স্বাভাবিক সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই একটি ন্যায্য, শক্তিশালী ও টেকসই রাজস্ব কাঠামো গড়ে উঠবে। এই স্বাভাবিক অর্থনৈতিক চক্রকে সক্রিয় করাই বিএনপি'র রাজস্ব কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু।

বিনিয়োগ সম্প্রসারণ - রাজস্ব বৃদ্ধির প্রথম শর্ত: ফ্যাসিস্ট শাসনামলে নীতির অস্থিরতা, আর্থিক খাতের দুর্বলতা ও বৈষম্যমূলক সুবিধা বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছে। বিএনপি বিনিয়োগ পরিবেশকে স্থিতিশীল, পূর্বানুমানযোগ্য ও ন্যায্য করার মাধ্যমে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ পুনরুজ্জীবিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি - করভিত্তির প্রাকৃতিক সম্প্রসারণ: কর্মসংস্থান সৃষ্টিবিনিয়োগের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ফল । বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ঘাটতি করভিত্তি সংকুচিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। শ্রমঘন খাতে বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে, শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষের আয়

বৃদ্ধি পাবে এবং আয়কর ও ভ্যাট—উভয় ক্ষেত্রেই রাজস্ব আহরণের সুযোগ তৈরি হবে। বিএনপি মনে করে, আয়কর ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কেবল প্রশাসনিক কড়াকড়ির মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের আয়ের সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমেই টেকসই হয়। অধিক মানুষ নিয়মিত ও সম্মানজনক আয় অর্জন করলে কর প্রদান একটি স্বাভাবিক নাগরিক আচরণে পরিণত হবে।

উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি - ভ্যাট ও পরোক্ষ করের বৃদ্ধি: বিএনপি বিশ্বাস করে, ভ্যাট রাজস্ব বাড়ানোর সবচেয়ে টেকসই উপায় করহার বাড়ানো নয়, বরং উৎপাদন ও ভোগের পরিধি সম্প্রসারণ। এজন্য বিনিয়োগবান্ধব নীতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং অভ্যন্তরীণ বাজার শক্তিশালী করা হবে।

আয়কর ভিত্তি সম্প্রসারণ - প্রবৃদ্ধিকে রাজস্বে রূপান্তর: বিএনপি আয়কর ব্যবস্থাকে তথ্যভিত্তিক ও সর্বজনীন করবে। ডিজিটাল লেনদেন, ব্যাংক হিসাব ও সম্পত্তির তথ্য ব্যবহার করে উচ্চ আয়ের ব্যক্তি ও ব্যবসাকে করের আওতায় আনা হবে, যাতে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির সুফল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রতিফলিত হয়। ফলে প্রবৃদ্ধি আর ‘করবিহীন প্রবৃদ্ধি’ হিসেবে রয়ে যাবে না।

কর ছাড় সংস্কারের মাধ্যমে প্রণোদনা থেকে রাজস্ব ক্ষয় বন্ধ: বিনিয়োগ বাড়ানোর নামে কর ছাড় দীর্ঘদিন ধরে রাজস্ব ক্ষয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি কর প্রণোদনাকে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করবে। যে প্রণোদনা বাস্তব বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, তা বজায় থাকবে; যা কেবল মুনাফা বাড়িয়ে রাজস্ব ক্ষয় ঘটাবে, তা বাতিল করা হবে।

সম্পত্তি ও সম্পদ কর: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে স্থাবর সম্পদ ও সম্পদমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। বিএনপি এই সম্পদ বৃদ্ধিকে করভিত্তিতে আনতে আধুনিক সম্পত্তি কর ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ থেকে সৃষ্ট সম্পদ রাজস্বে রূপান্তরিত হবে এবং কর কাঠামোর ন্যায্যতা বাড়বে।

কর প্রশাসন সংস্কার: বিএনপি কর প্রশাসনকে আধুনিক, পেশাদার ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলবে, যাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ সরাসরি রাজস্ব বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। কর প্রশাসন হবে সহায়ক, শাস্তিমূলক নয়—যাতে অর্থনীতির গতি ব্যাহত না হয়ে বরং করভিত্তি স্বেচ্ছায় বিস্তৃত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন

বিএনপি দেশের সব অঞ্চলের সবার জন্য সমতা-ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। দেশের যে অঞ্চল যেই অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত, বিএনপি সে অঞ্চলে সেই উপযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অগ্রাধিকার দিবে।

চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা: চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি, এই অঞ্চলকে কর্মসংস্থানের হাব হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন: বিএনপি দেশের উত্তরাঞ্চলকে দীর্ঘ অবহেলা ও শিল্পে পিছিয়ে পড়ার কালিমা থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। দেশের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী উত্তরাঞ্চলকে ঘিরে কৃষি ভিত্তিক শিল্পায়ন গড়ে তোলা হবে। উত্তরাঞ্চলের কৃষি-নিবিড় জেলাগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষায়িত 'কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও রপ্তানি অঞ্চল' গড়ে তুলে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন, উত্তরাঞ্চলের মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান ও সে অঞ্চলের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

হাওর-বাওড় অঞ্চলের উন্নয়ন: হাওর-বাওড় এলাকার মানুষের টেকসই উন্নয়নের জন্য পানি-কেন্দ্রিক অবকাঠামো ও জীবিকাভিত্তিক অর্থনীতি শক্তিশালী করা হবে। এ লক্ষ্যে বন্যা ও আকস্মিক ঢল মোকাবিলায় টেকসই বাঁধ, জলনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পূর্বাভাসভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হবে। পাশাপাশি যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৌসুমি বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে মানব উন্নয়ন সূচক উন্নত করা হবে। হাওর অর্থনীতি পুনর্গঠনে কৃষি, মৎস্য, হাঁস পালন, পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, হাওর ও হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই প্রথম ১৯৭৭ সনে 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করেন।

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন: উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে জলবায়ু অভিযোজন, নিরাপদ জীবিকা ও অর্থনৈতিক সংযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে নারী, শিশু, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, জেলে ও অন্যান্য পেশাজীবীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় টেকসই বেড়িবাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। লবণাক্ততা সহনশীল কৃষি, আধুনিক মৎস্য ও সামুদ্রিক অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন এবং আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'উপকূল উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করা হবে।

অর্থনৈতিক জোন, ইপিজেড, বিসিক শিল্পাঞ্চল: দেশের প্রতিটি প্রান্তের অর্থনৈতিক জোন, ইপিজেড, বিসিক শিল্পাঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে প্রতিটি অঞ্চলে নতুন করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে। এলক্ষ্যে বিনিয়োগবান্ধব নীতি, একক-সার্ভিস উইন্ডো ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ দ্রুত আকর্ষণ করা হবে।

নগরায়ণ ও আবাসন

প্রত্যেক নাগরিকের আবাসের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। বিএনপি'র লক্ষ্য বাংলাদেশের নগর ও অঞ্চলগুলোকে পরিকল্পিত, উৎপাদনশীল ও পরিবেশবান্ধব বাসযোগ্য এলাকায় রূপান্তর করা। উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি ও আধুনিক নকশার মাধ্যমে জাতীয় আবাসন সংকট সমাধান এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

পরিকল্পিত আবাসন: অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল নগরায়ণ রোধকল্পে একটি জাতীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত আবাসন (যেমন: গুচ্ছ আবাসন (ক্লাস্টার্ড রেসিডেন্স) ও বহুতল আবাসন (ভার্টিক্যাল রেসিডেন্স) এবং নগরায়ন নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। নগর উন্নয়নে 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' ও 'ভূমি-ব্যবহার মানচিত্রায়ন' পদ্ধতি চালু করা হবে। কৃষি, শিল্প, আবাসন ও সবুজ এলাকা, প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট জোন চিহ্নিত করে একটি 'জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন করা হবে। পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও উর্বর জমিকে এলোমেলো উন্নয়ন থেকে সুরক্ষিত করা হবে। সারাদেশে দক্ষ, অর্থনৈতিকভাবে ও জলবায়ু সহনশীল আবাসন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

'সেকেন্ডারি সিটি' কার্যকর করা: ঢাকার ওপর অতিরিক্ত চাপ কমাতে 'সেকেন্ডারি সিটি' গুলোকে কার্যকর করা হবে। এ লক্ষ্যে, এ সকল শহরে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক অবকাঠামো বিনিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরে প্রণোদনার মাধ্যমে এগুলোকে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

সীমিত আয়ের ও বস্তিবাসী মানুষের জন্য আবাসন সুবিধা: বিএনপি সীমিত আয়ের ও বস্তিবাসী মানুষের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক বহুমুখী প্রকল্পের আওতায় সাশ্রয়ী মূল্যে পরিকল্পিত আবাসন সুবিধা প্রদানের প্রয়াস নিবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন নিশ্চিত করা হবে। শতভাগ নগরবাসীকে পাইপলাইনে গ্যাস, পানি ও আধুনিক স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা এবং শহরগুলোকে সবুজায়নের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস নেয়া হবে।

সমন্বিত বর্জ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা চালু: সমন্বিত বর্জ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে। সকল সিটি করপোরেশনে আধুনিক কেন্দ্রীয় স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও রিসাইক্লিং সুবিধা গড়ে তোলা হবে।

'ভূমি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ: ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য 'ভূমি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। এতে, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে দুর্নীতি

হ্রাস, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম দমন এবং জাল দলিলের মাধ্যমে ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

'ভূমিসেবা মেলা' আয়োজন: আয়কর মেলার মতো প্রতিবছর প্রতি উপজেলায় একবার মাসব্যাপী 'ভূমিসেবা মেলা' আয়োজন করা হবে। সাধারণ মানুষ এক জায়গায় এসে তাদের জমি-জমা সংক্রান্ত সব ধরনের সেবা (নামজারি, রেজিস্ট্রেশন, খাজনা পরিশোধ, রেকর্ড সংশোধন ইত্যাদি) সহজে, স্বচ্ছভাবে ও দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবে। এর ফলে জনগণের ভূমি সংক্রান্ত সেবায় দুর্নীতি ও ভোগান্তি হ্রাস পাবে।

স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়ন: স্থানীয় সরকারকে নগর ব্যবস্থাপনার প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে সক্ষম করা হবে। নগর পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার ও সেবা প্রদানে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাকে ক্ষমতায়ন করা হবে। দুর্নীতি ও জটিলতা কমাতে একীভূত ডিজিটাল ভূমি ও পরিকল্পনা পোর্টাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

'সিটিজেন্স সার্ভিস কর্ণার' স্থাপন: পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট স্থাপনসহ প্রবীণ নাগরিকদের বিশ্রাম সুবিধা প্রদান, সাশ্রয়ী মূল্যে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ঢাকা-সহ দেশের প্রতিটি মহানগরী ও জেলা শহরে 'সিটিজেন্স সার্ভিস কর্ণার' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যা পর্যায়ক্রমে উপজেলা ও পৌরসভা গুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যাপ্ত 'সাইড ওয়াক বেঞ্চ' স্থাপন করা হবে।

আধুনিক ও নিরাপদ নগর: ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্থায়ী পরিকল্পনা আর নাগরিক অংশগ্রহণ নিয়ে আধুনিক ও নিরাপদ শহর গড়ে তোলা হবে। টেকসই পরিবহন, ডিজিটাল পরিষেবা, সেন্সর-ভিত্তিক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, বর্জ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা সবই হবে নিরাপদ আর সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য। পাশাপাশি, নাগরিকরা সহজভাবে অন-লাইন পোর্টালের মাধ্যমে সরকারি সেবা পাবে, প্রয়োজনীয় তথ্য জানবে এবং শহরের সিদ্ধান্ত-গ্রহণে অংশ নিতে পারবে। ফলে, জীবনযাত্রা উন্নত হবে, জলবায়ু ঝুঁকি কমবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে।

নিরাপদ ও টেকসই ঢাকা বিনির্মাণ

মনোরেল চালুকরণ: মেট্রোরেলের পাশাপাশি মনোরেল ব্যবস্থা চালু করা হবে। এর ফলে, রাজধানী ও তার কাছাকাছি বিভিন্ন স্থানগুলোকে আরো সহজে ও নিরাপদে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে।

নারী নিরাপত্তা ও নারীবান্ধব বাস চালুকরণ: নারীদের সার্বক্ষণিক নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে প্রাথমিকভাবে ঢাকার বিভিন্ন রুটে 'শুধুমাত্র নারী যাত্রী' বাস (পিংক বাস) চালু করা হবে। পরীক্ষামূলকভাবে সেখানে ড্রাইভার ও সহকারী হিসেবেও নারীরা থাকবেন।

ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল (ইভি) চালুকরণ: ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ভালো করার লক্ষ্যে ঢাকা শহরে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল চালু করা হবে।

আইটিএস ও সিসিটিভি নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি: ঢাকার প্রধান সড়কে 'ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (আইটিএস)'-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে যানজট কমানো এবং শহরের সকল প্রান্তে পর্যাপ্ত সিসিটিভির মাধ্যমে জন-নিরাপত্তা বাড়ানো হবে। যানবাহনে ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও টোলিং চালু করে শহর ও মহাসড়কের যানজট কমানো হবে।

শেয়ারড পার্কিং: ঢাকা শহরে পার্কিং সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে এবং শেয়ারড পার্কিং উৎসাহিত করা হবে।

রিক্সা-চলাচলে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ: রিক্সা-চলাচলে সমন্বয় ভিত্তিক বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। রিকশাচালকদের ফ্রি ট্রেইনিং করানো হবে এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

বৃত্তাকার নৌ-পথ এবং রিং রোড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ: ঢাকার উপর আন্তঃজেলা ট্রাফিকের চাপ কমাতে রিং রোড নেটওয়ার্ক, তার সাথে সংযুক্ত রেডিয়াল রোড দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ গঠন: ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করার জন্যে একটি স্বাধীন মেট্রোপলিটন পরিবহন কর্তৃপক্ষ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ভাসমান ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন: ভাসমান ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী (রাস্তার পাশে, স্টেশন, নৌঘাট বা ফুটপাতে বসবাসকারী, জলবায়ু উদ্বাস্তু), লিঙ্গ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, মাদকাসক্ত ও পুনর্বাসনবঞ্চিত মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে ও নিরাপদ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নগর দারিদ্র্ বিমোচন: নগর দারিদ্র্ বিমোচনের লক্ষ্যে শহর ও নগরের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য জনসংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা সেবার আওতা সম্প্রাসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বস্তিবাসীর আবাসন সংকট নিরসন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন: কড়াইল বস্তির বাসিন্দাদের আবাসনসংকট নিরসনের লক্ষ্যে সেখানে ছোট ছোট ফ্ল্যাট নির্মাণ করে তাদের প্রত্যেকের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে। ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য বস্তি ছাড়ার আগেই প্রত্যেক বস্তিবাসী পরিবারকে ফ্ল্যাটের অগ্রিম বরাদ্দপত্র দেয়া হবে। পাশাপাশি সেখানে বসবাসরতদের সন্তানদের শিক্ষা ও সবার স্বাস্থ্যের উন্নয়নেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পর্যটন খাত

প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও বিশ্বে একটি পর্যটক-প্রিয় দেশ হয়ে উঠতে পারেনি। পর্যটন শিল্পকে জনপ্রিয়করণ, এর প্রসার ও বিকাশ এবং বাংলাদেশকে পর্যটন-বান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা হালনাগাদ করা হবে। বাংলাদেশে পর্যটকদের প্রবেশ-পথগুলোকে এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন, ঝামেলামুক্ত, সেবামুখী এবং আকর্ষণীয় প্রবেশ-পথ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পর্যটন-বান্ধব নীতি প্রণয়ন: দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর আবাসন, নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করা হবে। বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার্থে ভিসা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সহজীকরণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দোভাষী ও পর্যটক-বিদেশি ভাষায় দক্ষ গাইড সেবা নিশ্চিত করা হবে। বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার্থে একটি একক অনলাইন পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে, যেখানে থাকবে হোটেল বুকিং, ভিসা সহায়তা, গাইড সার্ভিস, ভাষান্তর ও নিরাপত্তা তথ্য। এছাড়া পর্যটন খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে এআই-ভিত্তিক ভ্রমণ পরামর্শ ও ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ট্যুর

অভিজ্ঞতা সংযোজন করা হবে। পর্যটন শিল্পের সমন্বিত ও পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য পর্যটন-বান্ধব আইন প্রণয়ন করা হবে। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্য ট্যুরিস্ট পুলিশ নিয়োগ দেয়া হবে।

ইকো-ট্যুরিজম বিকাশ: পর্যটন শিল্পের প্রধান মূলধন প্রকৃতি ও সংস্কৃতি সঠিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন বিশেষভাবে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে। গ্রামের চিরায়ত সংস্কৃতি যেমন জারিগান, সারিগান, গম্ভিরা, যাত্রা-পালা, লাঠি-খেলাসহ গ্রামীণ খেলাধুলা, গ্রামীণ ঢাক-ঢোল, চারু ও কারুকলা, গ্রামের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রকৃতি, নদী-নালা প্রভৃতি দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে।

'কমিউনিটি ট্যুরিজম', 'এথনিক ও ওয়াটার ট্যুরিজমের' বিকাশ: 'কমিউনিটি ট্যুরিজম'-কে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শুরুতে বাংলাদেশের প্রতি জেলায় ন্যূনতম একটি গ্রামকে বেছে নিয়ে রাত-যাপনের সুবিধাসহ গ্রাম-পর্যটন গড়ে তোলা হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে। দেশের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে 'এথ্নিক ট্যুরিজম' এবং 'ওয়াটার ট্যুরিজম' চালু করা হবে।

ট্যুর গাইড'-কে মর্যাদাপূর্ণ পেশায় পরিণতকরণ: প্রতিটি পর্যটন এলাকায় স্থানীয় তরুণদের জন্য 'স্মার্ট ট্যুর গাইড'-কে মর্যাদাপূর্ণ ও লাভজনক পেশা হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

রন্ধনশৈলী পর্যটনের প্রসার ঘটানো: পর্যটকদের জন্য প্রতি বছর 'ঢাকা ফুড অ্যান্ড কালচার ফেস্ট' আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে স্থানীয় রেস্টুরেন্ট, রন্ধনশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের অংশগ্রহণে এই উৎসব বাংলাদেশকে বিশ্বে পরিচিত করবে 'স্বাদ ও সংস্কৃতির রাজধানী' হিসেবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতি

ধর্মীয় সম্প্রীতি

ধর্ম-বর্ণ, কিংবা ভৌগোলিক-আদর্শিক অবস্থান নির্বিশেষে, প্রত্যেক নাগরিক যেন তার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার বিনা বাধায় উপভোগ করতে পারে—এই লক্ষ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা লাখো প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান—এমন প্রশ্ন ছিল না। বিএনপি মনেকরে, স্বাধীন বাংলাদেশেও তথাকথিত সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু নিয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই। দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। আমরা বিশ্বাস করি; দল-মত-ধর্ম যার যার; কিন্তু রাষ্ট্র সবার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার। প্রত্যেক নাগরিকের একমাত্র পরিচয়—আমরা বাংলাদেশী । এই বাংলাদেশ আমাদের সবার।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি নিশ্চিতকরণ: ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার’ এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন। কাউকে কোন নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করতে দেয়া হবে না। দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং প্রতিটি গোষ্ঠী-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে যার যার ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব পালন করবে।

সকল ধর্মীয় প্রধানের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনমান উন্নয়ন: খতিব, ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবগণকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাসিক সম্মানি প্রদান করা হবে। তাদেরকে ধর্মীয় উৎসবে বিশেষ ভাতা প্রদান করা হবে। অন্যান্য ধর্মের (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য) উপাসনালয়ের প্রধানগণকে মাসিক সম্মানি, উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে। দক্ষতা-উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পার্ট-টাইম বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের অধিকতর আয়ের পথ সুগম করা হবে। খতিব, ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেব এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সকল ধর্মাবলম্বীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ভাঙচুর এবং তাদের সম্পত্তি দখলের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। একজন ‘মায়ের চোখে বাংলাদেশ’ যেমন, তেমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে যেখানে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী প্রতিটি সন্তান, প্রতিটি মানুষ নিরাপদে বসবাস করবে।

ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের উন্নয়ন: ধর্মীয়, শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান কল্যাণ বোর্ডে বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে গতিশীল করা হবে। ফাউন্ডেশনের বাজেট বরাদ্দ ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা হবে।

ইসলামী গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ: ইসলামী গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ইসলামী গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্রহণযোগ্য ওলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণে নিশ্চিত করা হবে। ধর্মীয় অঙ্গনে আলেমদের নির্বিঘ্নে, সসম্মানে ও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

সাশ্রয়ী, সহজলভ্যও প্রবাসীবান্ধব হজ্ব ব্যবস্থাপনা গঠন: ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের জন্য একটি সাশ্রয়ী, সহজলভ্য, মানবিক ও প্রবাসীবান্ধব হজ্ব ব্যবস্থাপনার গড়ে তোলা হবে। হজ্জ পালনের ব্যয় কমাতে রাষ্ট্রীয় ও কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ: ১৯৯৩ সালে বিএনপি সরকার প্রবর্তিত মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সারাদেশে বিস্তৃত করা হবে।

পাহাড় ও সমতলের নৃগোষ্ঠী

সকলের নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ: দল-মত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিগোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম-কর্মের অধিকার, নাগরিক অধিকার এবং জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

‘নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠা: দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত নৃ জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘নৃজাতি-গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেকসই শান্তি স্থাপন: সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণে ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যদের সন্ত্রাস ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনের জন্য আস্থা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া (কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স) ও সামাজিক পুনর্গঠন কর্মসূচি (সোস্যাল রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম) গ্রহন করা হবে।

পার্বত্য জেলা হাসপাতালের আধুনিকায়ন: স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে তিন পার্বত্য জেলার জেলা হাসপাতালগুলোকে আধুনিকায়ন করা হবে।

কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: পাহাড়ি পণ্য, হস্তশিল্প ও ইকো-ট্যুরিজমে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় যুবদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হবে।

এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম জোন প্রতিষ্ঠা: পার্বত্য এলাকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে ‘এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম জোন’ গড়ে তোলা হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।

শতভাগ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ: পাহাড় ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে যোগ্যদের পর্যায়ক্রমে শতভাগ সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার প্রয়াস নেয়া হবে।

ক্রীড়া

খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রমে ৪র্থ শ্রেণী থেকে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' কর্মসূচির মাধ্যমে ১২-১৪ বছরের প্রতিভাবান ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। ৪৫০টি উপজেলায় মানসম্পন্ন ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। ৬৪ জেলায় ইনডোর সুবিধাসম্পন্ন স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণ করা হবে। দেশের সব উপজেলায় ক্রীড়া অফিসার ও ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে বিষয়ভিত্তিক ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে বিকেএসপি'র শাখা প্রতিষ্ঠা করা হবে। সকল মহানগর সহ দেশের গ্রামীণ জনপদে খেলার মাঠের সুব্যবস্থা করা হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সুবিধা বঞ্চিতদের খেলার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। দেশে ক্রীড়া সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা হবে।

ওয়ার্ড-ভিত্তিক মাঠ তৈরি ও মাঠ দখলমুক্তকরণ: ঢাকা শহরে ওয়ার্ড/থানা ভিত্তিক খেলার মাঠ তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে। সম্ভব হলে দুটি ওয়ার্ডের মাঝে একটি মাঠ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বেদখল হওয়া খেলার মাঠগুলোকে পুনরুদ্ধার করা হবে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরিতে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ: ২০৩০ সালের মধ্যে খেলাধুলার কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ যাতে একটি গ্রহণযোগ্য স্থান করে নিতে পারে সে লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মাল্টি গেমস্ ইভেন্ট যেমন সাউথ এশিয়ান গেমস, এশিয়ান গেমস, কমন ওয়েলথ গেমস, অলিম্পিক গেমস ইত্যাদিতে বাংলাদেশের সম্মানজনক স্থান অর্জনের জন্য দেশে একটি আধুনিক জাতীয় অলিম্পিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

'ট্যালেন্ট হান্ট' স্কিম প্রচলন: স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে 'ট্যালেন্ট হান্ট' স্কিম চালু করা হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের সম্মানজনক জাতীয় পুরস্কার দেয়া হবে।

নারী ক্রীড়াবিদদের নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ: ক্রীড়াঙ্গনে নারী ক্রীড়াবিদদের হয়রানি নিরসণ এবং তাদের জন্য সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা প্রদানের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গনে দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধকরণ: ক্রীড়াঙ্গন ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ: ক্রীড়া ও খেলাধুলার উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষক, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্রীড়া সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য সরকারী ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে। ব্যাংক ও বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রীড়া ও খেলাধুলার মান উন্নয়নকে তাদের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির অন্তর্ভুক্ত করতে আরও উৎসাহিত করা হবে।

ক্রীড়ার অন্যান্য খাতে পেশাদার লীগ চালুকরণ: ক্রিকেট ও ফুটবলের পাশাপাশি হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, দাবা ও অন্যান্য খেলায়ও পেশাদার লীগ চালু করা হবে।

জাতীয় স্পোর্টস রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা: একটি জাতীয় স্পোর্টস রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি, এবং ডাটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

'স্পোর্টস ইকোনমি'-কে সম্প্রসারণ: 'স্পোর্টস ইকোনমি'-কে সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। ক্রীড়াঙ্গন যাতে দেশের অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করতে পারে সে লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

'স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি'-কে গুরুত্বারোপ: খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য ক্রীড়ায় অগ্রবর্তী দেশ/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পিপল-টু-পিপল সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি'-কে গুরুত্বারোপ করা হবে। দেশে আধুনিক ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

গণমাধ্যম

গণমাধ্যমকর্মীদের কাজের সুরক্ষা ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ: বিএনপি নির্ভীক ও পক্ষপাতহীন সাংবাদিকতাকে সম্মান করে। সাংবাদিকরা গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেন। বিএনপি অবশ্যই তাদের কাজের সুরক্ষা ও স্বীকৃতি প্রদান করবে। বিএনপি বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাকে সব সময় স্বাগত জানায়। সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচকের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে বিএনপি সর্বদা স্বচেষ্ট থাকবে।

আইনি জটিলতা ও হয়রানি দমন: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পুনঃনিরীক্ষণ করা হবে।

গণমাধ্যমের উপর আগ্রাসনরোধ: দেশের সকল প্রকার গণমাধ্যম, গণমাধ্যমকর্মী ও গণমাধ্যম অফিসের নিরবিচ্ছিন্ন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিএনপি বদ্ধপরিকর। গণমাধ্যমের ওপর যেকোনো ধরনের আক্রমণ ও আগ্রাসন কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।

জবাবদিহিমূলক নিয়ন্ত্রন কাঠামো গঠন: মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা, শিশু, নারী ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং গণমাধ্যমে নৈতিকতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষে একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক মিডিয়া রেগুলেটরি কাঠামো গড়ে তোলা হবে, যার লক্ষ্য। ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থার সাথে সমন্বয় করে গুজব ও ভুয়া খবর রোধ করা, ঘৃণামূলক বক্তব্য ও অপপ্রচার রোধ করা হবে। পাশাপাশি, এ সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ এবং ৩০ দিনের মধ্যে দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক করা হবে।

হত্যা ও নির্যাতনের বিচার নিশ্চিতকরণ: সকল সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার বিচার নিশ্চিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রুজুকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে। সাংবাদিক নির্যাতনরোধে বিশেষ সেল গঠন করা হবে।

'জাতীয় সাংবাদিক অবসর কল্যাণ বোর্ড' গঠন: সাংবাদিকদের

কল্যাণে নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। 'জাতীয় সাংবাদিক অবসর কল্যাণ বোর্ড' গঠন করা হবে।

রাজনৈতিক পক্ষপাতের অবসান ঘটানো: সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বরাদ্দে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অবসান ঘটানো হবে।

শিল্প ও সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ: সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনৈতিক আকাশ-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করা হবে। জাতীয় ঐতিহ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ-সঙ্গীত, নৃত্য-কলা, নাটক, সাহিত্য চর্চা, চলচ্চিত্রসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে সমৃদ্ধ করা হবে। বহিঃর্বিশ্বের যা কিছু শুভ ও কল্যাণময় সে সব উপাদান জাতীয় সংস্কৃতির সংগে সমন্বিত করা হবে।

জাতীয় ভাবধারাপন্থী ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান: জাতীয় ভাবধারার পরিপন্থী অপসংস্কৃতি চর্চাকে নিরুৎসাহিত করা হবে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার পথে সকল প্রকার বাধা অপসারণ করা হবে। সংস্কৃতির মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তাধারা ও মতাদর্শের যেন সুষ্ঠু প্রতিফলন হয় তার জন্য গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতির অনুসরণ করা হবে।

সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন চর্চার পরিবেশ গঠন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন চর্চার পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

সংস্কৃতি অঙ্গনে অবদানের স্বীকৃত সম্প্রসারণ: জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে অবদানের স্বরূপ জাতীয় পদক প্রদানের রীতি আরও সম্প্রসারিত করা হবে। উল্লেখ্য যে, বিএনপির হাত ধরে বাংলাদেশে স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক ইত্যাদি জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল।

নৈতিকতার শক্তি পুনরুদ্ধার

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে নৈতিক মূল্যবোধের ভয়াবহ অবক্ষয় ঘটেছে। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিএনপি একাডেমিক, সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা এবং ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।এলক্ষ্যে শিক্ষা কারিকুলামে যথাযথ সংস্কার করা হবে। এ জন্য গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো হবে। ছাত্র ও মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদেরকে মানবিক, সহিঞ্চু, ন্যায়ানুগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির সঠিক ও যথাযথ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হবে।

বর্তমানে কিশোরদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দরুণ সমাজে কিশোর গ্যাং-এর উপদ্রব মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জনমনে ব্যাপক অস্বস্তি ও নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে। এই সমস্যা সমাধানে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করে এই অগ্রহণযোগ্য উপদ্রব দমন করা হবে।

সবার আগে বাংলাদেশ

করবো কাজ, গড়বো দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি
২৮/১ ভিআইপি রোড, নয়া পল্টন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৩২০০৬৪
ইমেইল: info@bnpbd.org
www.bnpbd.org